ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজ।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং

কলিকাতা।

৭২ নং অপার সরকিউলার রোড।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্ট। দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৮ শক।

মূল্য ।০ আনা ।

উপক্রমণিকা।

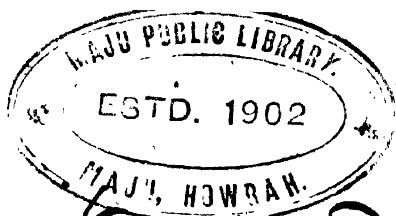
মনুষ্য যখন ধর্ম্ম চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন আপনাকে এই বিচিত্র জগতের অন্তর্ভূত একটী পদার্থ বলিয়া চিন্তা করে। প্রথমতঃ পিতা মাতা, তৎপর সাধারণ পরিবার, তৎপর প্রতিবাসী, তৎপর গ্রামবাসী, নগরবাসী, দেশবাসী, বিদেশবাসী, সাধারণ জগদ্বাসী মানবগণের প্রকৃতি ও সম্বন্ধের আলোচনা করিতে থাকে। এতৎ ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বায়ু ও আলোকপূর্ণ আকাশ, মেঘ, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি পদার্থনিচয় এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির অন্তর্গত গূঢ়তত্ত্বসকল তাহার আলোচনার বিষয় হয়। আবার ইহার প্রত্যেকেরও আপনার মধ্যে যে একটী অকাট্য সম্বন্ধ সূত্র লম্বিত আছে তাহা এবং সেই সম্বন্ধসূত্রের মূলীভূত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ জগদ্বিধাতা পরম পুরুষ সহ নিজের ও আধারণ জগতের সম্বন্ধ সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। জগতের এই পারম্পরিক সম্বন্ধ ও জগৎ প্রতিষ্ঠাতা মঙ্গলময় আদিপুরুষের সঙ্গে নিজের ও প্রত্যেক জড়, প্রাণ ও আত্মার সম্বন্ধ, মানব ধর্ম্মবিজ্ঞানের মুল উপাদান। এই উপাদান লইয়া ধর্ম্মক্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্রমের বীজমাত্র এই গ্রন্থ মধ্যে রোপিত হইল। ইহার যে কয়েকটী অঙ্কুর আমার জ্ঞানের আয়ত্ত ছিল, তাহা পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায় নামে অঙ্কুরিত করা গেল।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ নামক এই পুস্তকের অভিধেয় অতি বিস্তৃত। আমার এমন স্বচ্ছলতা নাই যে আমি এক যোগে সমগ্র বিষয় একত্র সমাবেশ করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করি। এজন্য ইহার নয়টী মাত্র অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করা গেল। যদি ইহার প্রতি সাধারণের অনুরাগ জন্মে এবং ইহার দ্বারা কাহারও জীবনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়, তবে আমার ভবিষ্যৎ আশা সফল করিতে যত্ন করিব।

আমার রচনাপ্রণালী ভাল হইবে না ইহা আমি জানি। কেবল আমি কেন যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ জানে, সেই জানে তাহার কার্য্য উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট; কিন্তু আমি যে বিষয় গুলি লিখিলাম, তাহা আমার নিজের বুদ্ধি রচিত বিষয় নহে, তাহা সাধারণ মনুষ্যজাতির আবিষ্কৃত সত্য। সুতরাং এবিষয়ে আমার অনুনয় বিনয় নিষ্প্রয়োজন। তথাপি শিষ্টাচারানুরোধে আমি বিনয়ের সহিত বলিতেছি, যদি ইহাতে কোন দোষ দৃষ্টি হয়, সাধুগণের নিকট তৎসম্বন্ধে ক্ষমা চাহি।

শ্রদ্ধাষ্পদ ভাই শ্রীযুক্ত বাবু গৌরিগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই বিষযে উৎসাহ প্রদান করেন, আমি সেই উৎসাহে ও অনুরাগের বলে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার আদ্যোপান্ত তিনি স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।



ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজ।

প্রথম অধ্যায়।

জগৎ।

জগতের সাধারণ তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, অগ্রে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, জগৎ বলিতে বুঝায় কি? জগৎ বলিতে উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তু বুঝায়। যাহা কোন দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত ঈশ্বর আপন শক্তিতে সৃষ্টি করেন, তাহাই সৃষ্ট, তাহাই জগৎ। জগৎ এক দিনে হয় নাই, কিন্তু ক্রমে হইতেছে। মনুষ্যাত্মা পূর্ব্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে, পরেও হইবে, সুতরাং যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা সমুদায়ই জগৎ। ফলতঃ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখি, কর্ণ দ্বারা যাহা শুনি, জিহ্বা দ্বারা যাহার আস্বাদ লই, নাসিকা দ্বারা যাহার গন্ধ পাই, চর্ম্ম দ্বারা যাহা স্পর্শ করি, এ সমুদায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই জগৎ। এতদ্ব্যতীত সাক্ষাৎ, অনুভূতি, অনুমান, উপমানাদি

দ্বারা যে সকল বস্তুতত্ত্ব অবগত হই, তাহাও জগৎ ? এই জগৎ অগণ্য। জগতের প্রত্যেক বিষয়ের পরিচয় দেওয়া মনুষ্য শক্তির অতীত। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি কে যে তাহা পরিত্যাগ করিব না ? তাদৃশ কার্য্য এক জন কি দুই জনের চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে না। দুই বৎসর কি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিলেও কিছু হয় না। এমন কি সমস্ত পরমায়ু নিঃশেষ করিলেও ইহাতে সিদ্ধকাম হওয়া অসম্ভব। তবে এখন কর্ত্তব্য কি ? কর্ত্তব্য এই, বস্তু সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর স্বভাব ও নিয়মাদি হইতে স্রষ্টার যে মঙ্গলভাব দোহন করিতে পারা যায়, বন্ধুদিগকে তাহাই উপহার প্রদান করা।

এই অসীম জগৎ, যাহার এক সীমা হইতে সীমান্তর গমন করিতে বা দর্শন করিতে কোন মনুষ্য সমর্থ হয় না, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যাহার বাচ্য, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বসকল অবগত হইবার উপায় কি ? জগৎ দেখিয়া যদি ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়, জাগতিক ঘটনাবলীর পরিচয় না পাইলে, তাহা অবগত হওয়া দুষ্কর। অথচ উহার অধিকাংশ বিষয় পার্থিব বস্তুতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়া আছে। এ জন্য অগ্রে জগতের মূল উপাদান গুলির প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। জগতের মূল উপাদান কি ? পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, আকাশ, বায়ু,

জল, ভূমি, অগ্নি প্রভৃতি ভূত, এবং দিক্, দেহী, মনঃ, এই সকল জগতের উপাদান। ভূত শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অমিশ্র বা রূঢ় পদার্থ। আর কিছুরই সঙ্গে যাহার সম্মিশ্রণ নাই, যাহা ঠিক ও বিশুদ্ধ, তাহাই ভূত. সুতরাং যাহা ভূত তাহাই জড় জগতের মূল উপাদান। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণ পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের এই ভূতবাদের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি বস্তু বাস্তবিক অমিশ্র নহে মিশ্র, সুতরাং তাহারা ভূত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যে সকল অমিশ্র বস্তু অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতির উপাদান, এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি যে সমস্ত ধাতব বস্তু অমিশ্র বলিয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই ভূত। এতদ্ব্যতীত দেহী ও মনকেও জগতের উপাদান বলিয়াছেন। দেহী অর্থাৎ যাহার দেহ আছে। দেহ নাই কাহার? এ জগতে সকল বস্তুই দেহবিশিষ্ট, সকল বস্তুই নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বা শরীরবিশিষ্ট। সুতরাং দেহী বলাতে ধাতু, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ বুঝিবার বাধা কি? বাধা অনেক। দেহী বলিলে যাহার দেহ আছে, তাহাকে বুঝাইয়া আরও কিছু বুঝায়। "আমার এই দেহ" যাহার বোধ আছে, এবং দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাকেই দেহী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেহী বলিলে বৃক্ষ লতাদি বুঝিবার বাধা জন্মিল। কেন না যদি বলি অমুক দ্রব্যটী আমার, তবে

যাহার নিকট বলিলাম, তিনি কি বুঝিলেন? তিনি বুঝিলেন, উল্লিখিত বস্তুতে আমার কর্তৃত্ব আছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বস্তুটী কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি। অতএব যাহার দেহের প্রতি কর্ত্তৃত্ব নাই, আমার দেহ বলিয়া বোধ নাই, তেমন ধাতু, প্রস্তর বৃক্ষ, লতাদি দেহী হইতে পারিল না। যাহা হউক, ভৌতিক পরমাণু সকল, আত্মা ও মন প্রভৃতিই যে জগতের মূল উপাদান তাহা নিশ্চিত।

ভৌতিক পরমাণু সকল নির্ম্মিত হইয়াই জগতের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সমুদায় জাগতিক কার্য্য নিয়মের অধীন। নিয়ম ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। জগতের যত বিষয় বিদ্যমান, তাহার প্রত্যেক বিষয়ের মূলে নিয়ম আছে এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেন না প্রসিদ্ধ জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই মত অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহার দৃঢ়তা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা চেষ্টা করুন বা না করুন, এ মত যে অতিশয় দৃঢ় তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ফরাসিস পণ্ডিত কোমত যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কোমত বলেন, জড়তত্ত্ব নির্ব্বাচন করিতে মনুষ্য সমাজে তিন প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রথম, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক। দ্বিতীয়, দার্শনিক

কাল্পনিক বা শক্তিমূলক। তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। যখন মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের ভাব অপরিস্ফুট থাকে, যখন মনুষ্যগণ প্রকৃতির সুন্দর সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী থাকেন, তখন তাঁহারা সকল বস্তুতেই এক একটী ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া লয়েন। যে বস্তুর উল্লেখ করেন, তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও একটী ইচ্ছা কল্পনা করিয়া লন। যেমন অস্ফুটজ্ঞান বালক গতিশীল কন্দুক ও কৃত্রিম পুত্রকাদিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা কল্পনা করে, যেমন বালকগণ অচেতন মৃৎপিণ্ডে বা উপলখণ্ডে আহত হইলে অথবা দেয়াল, কবাট ও কাষ্ঠাসন প্রভৃতিতে আঘাত হইলে, ঐ সকল বস্তুতে ইচ্ছা বিশিষ্ট কর্ত্তা আছে বলিয়া প্রতিপ্রহার করে, এবং তাহারই মত তাহারাও দুঃখ পাইল ভাবিয়া সন্তুষ্ট হয়। শিশুরা এরূপ করে কেন? তাহারা জগতের পূর্ব্বে আপনাকে দেখে, আপনার যেমন ইচ্ছা ভাবাদি আছে বলিয়া জানে, সেইরূপ জড় বস্তুতেও কল্পনা করে। তাহারা জানে তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহারা তাহাই করে, যাহা ইচ্ছা হয় না তাহা করে না। সুতরাং এ জগতে সকলকেই তাহারা আপনার মত ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে।

এইরূপ পৃথিবীর বাল্যাবস্থায় সরলপ্রকৃতি মনুষ্যগণও নিজের আত্মরূপ্য লইয়া জগতের সকল ঘটনাতেই কর্ত্তা দেখিতেন। সুতরাং এই সকল কর্ত্তার ইষ্টানিষ্ট ফলদাতৃত্ব

শক্তি আছে বলিয়াও মান্য করিতেন। এই কারণে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড়পিণ্ড দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছে। এই কারণে অগ্নি, বায়ু জল প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু এবং মেঘ, বজ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার দেবত্ব সৃষ্টি হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালের ব্যাখ্যা বলিয়া কোমত ইহাকে—পৌরাণিক, এবং নিজের সচেতন ইচ্ছা বিশিষ্ট আত্মার আনুকূল্য লইয়া হয় বলিয়া আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দান করিয়াছেন।

পরে যখন মনুষ্যের জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকে, তখন কাজে কাজেই পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। একটি লোককে আমরা সাধু বলিয়া সম্মান করিতে পারি, যতক্ষণ তাহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক না পাই, কিম্বা যতক্ষণ সেই কলঙ্কিত লক্ষণগুলি আমার অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত থাকে। কিন্তু যদি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অল্প মাত্রও অসাধু ভাব দেখিতে পাই, অমনি সেই সাধুজনোচিত বিশ্বাস চলিয়া যায়, উহা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। সেইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জড়পিণ্ড; অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ, এবং মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা, যত দিন অপরীক্ষিত ছিল, তত দিন দেবতা ছিল। যখন পরীক্ষায় জানা গেল যে চেতনের যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তাহাদিগের নাই, তখন আর তাহাদিগের

দেবত্ব মনুষ্যহৃদয়ে অধিকার পাইবে কি রূপে? এই সময়ে মনুষ্য বুঝিতে পারিল, ঐ সকল বাস্তবিক দেবতা নহে, উহারা জড়। তবে তাহারা কার্য্য করে কি রূপে? অগ্নি কত পুঞ্জ পুঞ্জ তৃণ কাষ্ঠ অবলীলা ক্রমে ভস্ম করিতেছে; বজ্র নিপতিত হইয়া কত মহা বৃক্ষ ও প্রাসাদমালা চূর্ণ করিতেছে; সমুদ্রের জল বিক্ষুব্ধ হইয়া কত গ্রাম নগর ও পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, এ সকল কার্য্য ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব না থাকিলে কিরূপে হয়? তখন অনেক তর্ক যুক্তির পর স্থির হইল যে, প্রত্যেক বস্তুতেই এক একটী কার্য্যকরী শক্তি আছে। সেই শক্তির বলে কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে। যেমন জলের শীতলতা, অগ্নির দাহিকা শক্তি ইত্যাদি। এইরূপ মধ্যাবস্থায় বহুলপরিমাণ বহুদর্শনের পর "শক্তি" কল্পিত হয়। কোমত এই জন্য ইহাকে দার্শনিক, কাল্পনিক ও শক্তিমূলক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু মনুষ্যের উন্নতিশীল জ্ঞান ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কেন না এরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকৃততত্ত্ব জানা যাইতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, সেই জন্য সে তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি দগ্ধ করিতে পারে. ইহাতে জ্ঞানে তৃপ্তি হইল কৈ? অগ্নিত কোন পদার্থ নহে। অবশ্য কোন নিয়মানুসারে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং দাহিকা শক্তি সেই নিয়মের ফল। অতএব মধ্যাবস্থার

কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তের চরম সীমা বলিয়া স্বীকার্য্য নহে, সুতরাং ইহাতে জ্ঞান পরিতৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। যখন ঈদৃশ দার্শনিক ব্যাখ্যাতেও মনুষ্য সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তখন তাহারা প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে নিয়মানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ নিয়মানুসন্ধিৎসু মনুষ্যই পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কেন না তাহারা যত নিপুণ হইয়া চিন্তা করিতে থাকে, ততই রাশি রাশি নিয়মের বা প্রমাণের সূত্র সকল প্রত্যেক জগৎকার্য্যের মূলে দেখিতে পায়। ইহাকে কোমত বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

কোমতের এই মতকে আমরা পণ্ডিতাভিমানীদিগের হৃদয়গ্রাহী বলিয়া স্বীকার করি। ইহা দ্বারা শিক্ষিতসমাজে যত দূর উপকার হওয়া উচিত, বস্তুতঃ তত দূর হইয়াছে কি না সন্দেহ? কোমত বলেন, নিয়মেই সমস্ত বিশ্বব্যাপার চলিতেছে, নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না ও হইতে পারে না, এবং নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞাতব্যও আর কিছু নাই। এ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, নিয়ম বলিলেই যে নিয়ন্তাকে বুঝা অনিবার্য্য কোমতের মুখে এ কথাটি আসিল না। কেবল যে এই কথাটি আসিল না তাহা নহে। কোমত আবার বলিলেন, জগতের মূল কারণ মানুষের অপরিজ্ঞেয়। যদিও চেষ্টা করিলে এই সকল কথা দ্বারা কথঞ্চিৎ নাস্তিকতা খণ্ডিতে পারে, তথাপি কোমতের এই কথাতে দুইটী

অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের আর জ্ঞাতব্য কিছু নাই, অথচ নিয়ম বলিলে নিয়ন্তাকে বুঝা স্বাভাবিক. এমন কি না বুঝিলেই চলে না। কোমত এই স্বাভাবিক বোধ্য বিষয়কে জ্ঞানের পথে আসিতে বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ "জগতের মূল কারণ অপরিজ্ঞেয়" বলাতে তিনি যে নিয়মমূলক ব্যাপারকে চক্ষুষ্মতা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, চক্ষুষ্মতী হইয়াও উহা অন্ধ হইয়াছে।

কোমত জগতের তত্ত্বনির্ব্বাচনজন্য যে তিন প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন, তাহার উন্নতির ক্রম ধরিয়া দেখিলে আমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কাল যত অতীত হইয়াছে, অনুসন্ধান যত বাড়িয়াছে, মনুষ্যগণ ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কেননা পৌরাণিক সময়ে বরুণ জলের দেবতা বলিয়া পূজিত ছিলেন; দার্শনিক সময়ে সেই বরুণের দেবত্ব দূর হইয়া শৈত্যশক্তির আধার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন; পরে বৈজ্ঞানিক সময়ে সেই বরুণ উদ্জন ও অম্লজনের সমষ্টি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা, পরে দাহিকাশক্তিসম্পন্ন জড়. তৎপর রাসায়নিক কার্য্যের ফল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে বুঝিতে অতি সহজ যে, যখন মনুষ্যগণ জড় বস্তুতে ঐশী শক্তি আরোপ করিতেন, তখন তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দার্শনিক

সময়ে তাঁহারা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া-ছিলেন। তৎপর বিজ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আলোক দান করিল। তখন মনুষ্য বুঝিল যে নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্য আর কিছুই জানিতে পারে না, একথা মিথ্যা। কেননা, নিয়ম কার্য্য। কার্য্য কি কখন কারণ ভিন্ন হইতে পারে? অতএব যেমন কার্য্য তেমন কারণ আছেই আছে; যেমন নিয়ম, তেমনই নিয়ন্তা আছেই। সুতরাং নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তাকে বুঝাও স্বাভাবিক। কোমতও নিয়ন্তা না বুঝিয়া এই শৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের কার্য্যে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন নাই। তবে তাহা অপরিজ্ঞেয় বলিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এই মাত্র। যাহা হউক, মনুষ্য যখন দার্শনিকদিগের কল্পিত বন্ধুরতাপূর্ণ সোপান অতিক্রম করে এবং বিজ্ঞানরূপ সমতল প্রশস্ত ক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখনই তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। বিজ্ঞানই ঈশ্বরের বিচিত্র বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি। এই ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র মনুষ্য বুঝিতে পারে, জগতের সমুদায়ই নিয়মের অধীন। সূর্য্য সৃষ্টিকাল হইতে শূন্য আকাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে, নিয়মে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত সেই সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, নিয়মে। চন্দ্র সেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, নিয়মে। বিদ্যুৎ নির্ঘোষিত হয়, নিয়মে।

পক্ষিসকল উড়িয়া যায়, নিয়মে; কুলায় নির্ম্মাণ করে, নিয়মে; ডিম্ব প্রসব করে ও শাবক পোষণ করে, নিয়মে। বায়ু বহিয়া জগতে প্রাণ বিতরণ করে, নিয়মে। ধূলি উড়িয়া যায়, নিয়মে। মনুষ্য মনে কখন কুভাব কখন সুভাব উদিত হয়, নিয়মে। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, নিয়মে; নির্ব্বাপ্ত হয়, নিয়মে; এবং তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, নিয়মে। মেঘ আকাশে সজ্জিত হয়,* নিয়মে; বারিবর্ষণ করে, নিয়মে। যেমন নিয়ম ভিন্ন কার্য্য হয় না, তেমনি নিয়ন্তা ব্যতীতও নিয়ম হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই, আমরা বলি, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের অতি সহজ জ্ঞাতব্য নিয়ন্তা।

সুতরাং আমরা এস্থলে কোমতের শাসন মান্য করিতে পারি না। কেননা উৎপন্ন বলিলে উৎপাদক, সৃষ্টি বলিলে স্রষ্টা এবং নিয়ম বলিলে নিয়ন্তা, স্বাভাবিকরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায় বলেন, জগতের মূল উপাদান ভূত বা পরমাণু সকল নিত্য। সেই পরমাণু-পুঞ্জের যে পৃথক পৃথক প্রকৃতি আছে, তাহারা সেই প্রকৃতির বলে নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। আমরা এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিতেও সম্মত নহি। প্রত্যেক উৎপন্নের উপযোগিতা দেখিলে, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলে, উৎপাদক বা স্রষ্টার মহান্ ভাব আপনাআপনি হৃদয়ে

মুদ্রিত হয়। সুতরাং যাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও তাদৃশ মঙ্গলনিষ্যন্দী ভাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহা দিগকে অন্ধতার দোষ হইতে চেষ্টা করিলেও বাঁচান যায় না।

জগতের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া হইতে আমরা কোন প্রাণ-বাহী শক্তির পরিচয় পাইতেছি। আবার জগতের বিপুলতা, জগতের সংখ্যাতিশয্য,* ও জগতের মনোহর কৌশলপূর্ণতা দ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে সেই শক্তি পবিমিত হইতে পারে না। পরিমিত শক্তির বলে তাদৃশ কার্য্যকলাপ সুন্দর প্রণালীমতে চলিতে পারে না। সুতবাং যাঁহার শক্তি অসীম, যাঁহার জ্ঞান অসীম, এইরূপ একটী অসীম গুণযুক্ত কর্ত্তার হস্তে জগতের সমুদায় কর্ত্তৃত্ব ভার না দিয়া আমরা কোনরূপেই থাকিতে পারি না।

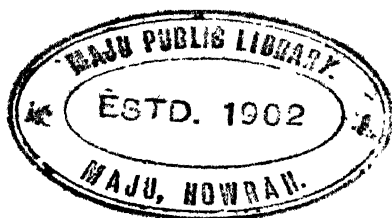
কিন্তু মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল ঈশ্বরকে তেমন অনন্ত গুণের আধার বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কেবল মিল কেন? কোমতও বলিয়াছেন "নিঃসন্দেহ প্রকৃতিকার্য্যে দোষ আছে"। ইহাঁরা এরূপ বলেন কেন? হয়ত তাঁহারা প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপে অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়াছেন, হয়ত ঈশ্বরের অপার কার্য্য প্রণালীর মধ্যে দয়া ও প্রেমের বৈষম্য দেখিয়াছেন। নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে পারেন নাই, এজন্য ঈশ্বরকে অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, অনন্ত

প্রেম ও অনন্ত জ্ঞানের আধার না বলিয়া, শক্তিমান্, জ্ঞানবান্, দয়াবান্ মিল স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কোমত তাহাও করেন নাই। তিনি কেবল এই বলিয়া নাস্তিক হইতে নিষেধ করিয়াছেন যে, যদি ঈশ্বরকে মানা যায়, তবে আমাদিগের কার্য্যকর্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায়, নতুবা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। কোমত যদি ঈশ্বর না মানিয়া কার্য্যসাধিকা বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, নাস্তিক হইতেন। তাঁহারা যে প্রকৃতির দোষ আছে বলিয়া প্রকৃতির স্রষ্টার ত্রুটি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ঈশ্বরকে অস্বীকার করাই ভাল ছিল। কেন না ইহাতে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর গভীরতার মধ্যে তাঁহাদিগের অনেক যত্নে প্রবেশ করা বিফল হইয়াছে। বহু দিন শিক্ষা করিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, বহু গুরুর মত লইয়া তাঁহারা প্রাকৃতিক কার্য্যবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার সৃষ্টিকৌশল অল্পমাত্র বুঝিতেই তাঁহাদিগের জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই স্রষ্টা ভূমা ঈশ্বরের কার্য্যে ত্রুটি আছে বলিয়া নিজের অভ্রান্ততা ও সেই অভ্রান্ত ঈশ্বরের ভ্রান্তিমত্তা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কি সামান্য কৌতুকাবহ? তাঁহারা বড় জ্ঞানী, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ অধিক

হওয়া উচিত, কিন্তু এ স্থলে অজ্ঞান ও অহঙ্কারের পরিমাণ বেশি হইয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মাইয়া দিয় ছে। কেন না ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে, সৃষ্টির অপার কৌশল ও নিয়ম দর্শন করিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, অথচ নিজের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি পশ্চাতে রাখিয়া ঈশ্বরের ত্রুটি দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। ধিক্ মানুষের বিদ্রোহিতা!! ধিক্ মানুষের কৃতঘ্নতা!! তাহাদিগের এই রূপ দুশ্চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু আমাদিগের হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর তিনি ছোট হইলেও ঈশ্বর! ক্ষুদ্র কীটোপম প্রজার কি সাধ্য সেই ঈশ্বরের ক্ষতি করিতে পারে? কিন্তু ইহাতে প্রজার ক্ষতি হইতে পারে, যেহেতু প্রজা দুর্ব্বল। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু একেবারে সব ক্ষতি করিতে পারেন নাই, উপকারও করিয়াছেন। উপকার কি? তাঁহারা ঈশ্বরকে যে অতি নিকৃষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতেও অনেক অনিষ্ট নিবারণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্ধত ও অন্ধ শিষ্যগণের অনেক প্রতিকার করা হইয়াছে। যাহাদিগের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সমান হইতেছিল, সাধু ধর্ম্মার্থিগণ সর্ব্বদা বেদনা পাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের সান্ত্বনা লাভের এই এক মাত্র পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতেই আমরা অনেক উপকৃত হইয়াছি; কিন্তু সুখী হইতে

পারিলাম না কেন? ঈশ্বরের অপমান সহ্য করা যায় না এই জন্য। আমাদিগের এক জন সামান্য বন্ধুর অপমান আমরা সহ্য করিতে পারি না, যিনি চিরকালের বন্ধু দীন হীনের বন্ধু তাঁহার অপমান কি সহনীয়? কখনই সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ পরম পিতার অপমান ও অনাদর সহ্য করা যায় না।* সুতরাং আমরা অসুখী।

এই সকল প্রদর্শিত উপায় ধরিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। সুতরাং ঈশ্বর হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে ইহা বুঝিলাম। ঈশ্বর নিয়মের সহিত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ সেই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, ইহাও বুঝা গেল। এই সকল জগতের মধ্যে আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয় পৃথিবী। তবে আনুষঙ্গিকরূপে দুই একটী কথা অন্যত্রকারও বলা যাইতে পারে। জগতের স্বভাবানুসারে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা গেল। প্রথম জড় জগৎ, দ্বিতীয় প্রাণিজগৎ, তৃতীয় অধ্যাত্ম জগৎ।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

জড় জগৎ।

জড় জগৎ কি? জড় বলিলে আমরা কি বুঝিব? জড় বলিলেই আমাদিগের মনোমধ্যে কতকগুলি অভাবের ভাব মুদ্রিত হয়। যাহার চলিবার বলিবার চিন্তা করিবার বুঝিবার ও বোধানুসারে কার্য্য করিবার শক্তি নাই, জড় বলিলে এরূপ কতকগুলি অভাবান্বিত বস্তুর ভাব আমাদিগের মনে পড়ে। বস্তুত আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা এইরূপ অভাবশালীই বটে। পূর্ব্বে যে ভূত সকলের কথা বলা গিয়াছে, সেই ভৌতিক পরমাণু যাহার মূল উপাদান, তাহা এইরূপ অভাবগ্রস্ত জড়। জড়রাজ্যের অভাবের কথা চিন্তা করিলে মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। যখন ভাবিতে বসি, তখন জড়রাজ্য দুঃখের আলয়রূপে দেখিতে পাই। যাহাদের এত অভাব তাহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, তাহারা আপন অভাব দূর করিবার জন্য যত্নশীলও নহে। কি চমৎকার! অভাব আছে অথচ অভাব বোঝে না? অভাব না বুঝিলে দূর করিতে চেষ্টা হয় কাহার? যাহার দরিদ্রতার সীমা নাই, সে তাহা বোঝে না, ইহা কি সামান্য রহস্য? জড়ের যে এত অভাব, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল

উপাদান। যেমন উপাদানে গঠিত, তাহা তেমনই গুণশালী। ভৌতিক পরমাণু সকল অচেতন, বোধ ভাব ও ইচ্ছা বিহীন, সুতরাং অন্য সহস্র প্রকার গুণশালী হইলেও তদ্দারা সংগঠিত পদার্থ নিচয়ের সে অভাব থাকিবেই থাকিবে।

এই যে ভৌতিক পরমাণুসংগঠিত জড় রাজ্যের কথা বলিলাম, ইহার দুইটী প্রধান গুণ আছে। এক আকৃতি, অন্য বিস্তৃতি। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বস্তু সকলকে যে যে গুণ বা প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সকল গুণানুসারে পরিচিত হইয়া থাকে। ভৌতিক পরমাণুর গুণ অনেক, কিন্তু প্রধান গুণ আকৃতি ও বিস্তৃতি। কেন না এই দুইটী গুণ সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং এই দুইটী গুণ পরস্পর অপরিহার্য্য, একটী থাকিলে অন্যটিও থাকা চাই। যাহার আকৃতি আছে, তাহার বিস্তৃতি একান্তই থাকিবে, এবং বিস্তৃতিমৎ বস্তুর আকৃতি অবশ্যম্ভাবী। আকৃতি আছে, বিস্তৃতি নাই; এরূপ হইতে পারে না। আবার বিস্তৃতি থাকিলেও আকৃতি না থাকিলে চলে না। যাহার আকৃতি আছে, তাহা যদি এমত সূক্ষ্ম হয় যে আমরা উহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে না পাই, তথাপি তাহা যে কিয়ৎপরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিবে তাহার কোন সংশয় নাই। আবার যাহা স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাও কোন না কোন আকার বিশিষ্ট হইবেই হইবে। কীটাণু সকল অতি সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য

আছে। তবে "মনুষ্যজাতিকে সুখী করাই তাদৃশ উপ-যোগিতার প্রয়োজন" বলাতে অবশ্যই দোষ হইয়াছে? না। ইতর জন্তুদিগের জ্ঞান ভাবাদির সদ্ভাব নাই। সুতরাং চিন্তা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সামঞ্জস্য তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এজন্য বস্তু গুণ, ইষ্টানিষ্ট ও ফলাফল চিন্তা করিয়া তাহারা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তাহা না পারিলেও জড়ের উপযোগিতার ফল সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব অতি সহজে বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক বস্তুর উপযোগী হইলেও তাহারা কেবল উপযোগী মাত্র। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এবং চিন্তা ও যত্নের সমাধান ব্যতীত শুদ্ধ ইন্দ্রিয়মাত্র দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, বস্তুর গুণেই বস্তু পরিচিত হয়; কিন্তু কাহার নিকটে? বস্তুর গুণানুসারে বস্তুকে গ্রহণ করা কি ইন্দ্রিয়ের সাধ্য? কখনই না। ইন্দ্রিয়গণ বস্তুজ্ঞানের দ্বার মাত্র, গ্রহীতা নহে। জ্ঞানই গ্রহীতা। আবার ইচ্ছা ও ভাব সংশ্রয় না হইলে সে জ্ঞানও অচল। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ, সকলেই ভৌতিক বস্তুর গুণে কখন উপকৃত কখন বা অপকৃত হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল বস্তুকে উপকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। আবার উপকার হউক, কি অপকার হউক, মানুষের নিকট অগৃহীত থাকিতে

পারে না। অতএব যদিও ইতর জন্তুগণের মধ্যে প্রাকৃতিক উপযোগিতার স্থূল কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করা যায়, তথাপি পূর্ব্বোক্ত গুণসকলের অসদ্ভাব হেতু মনুষ্যকেই সুখলাভসম্বন্ধে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

জড় বস্তু একটী দুইটী গুণের আধার নহে। অবস্থা ভেদে প্রত্যেক জড় বস্তু অগণ্য গুণের আধার। সঙ্কোচন, প্রসারণ, অবসাদন, উত্তেজন, পরিবর্ত্তন, পোষণ, নিয়োজন, ও বিয়োজন প্রভৃতি অসংখ্য গুণ এবং ক্ষারত্ব, অম্লত্ব, তিক্তত্ব, কষায়ত্ব, কটুত্ব প্রভৃতি অগণিত রস জড় রাজ্যে অবস্থান করে। আবার এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তু মিলিত হইলে নূতন গুণ ও রস উৎপন্ন হয়। জড় যে এত গুণ ও রস পোষণ করে, ইহার কোনটী কি তাহার নিজের প্রয়োজনে আইসে? ভাবিয়া দেখিলে একটীও না। পূর্ব্বে ভৌতিক বস্তুর যে সকল অভাবসূচক লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা জানা যায়, তাহারা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানবিরহিত; এবং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা প্রভৃতিও তাহাদিগের নাই। আবার জড়রাজ্যের গুণ ও রস সকল ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই বোধ্য, অন্য প্রকারে নহে। যখন জড়ের ইন্দ্রিয়জ্ঞান নাই, তখন যে তাহার নিজের গুণ রসাদি অনুভব করিবার নিজের সামর্থ্য নাই, ইহাও অতি সহজে বোধ্য। জড় যে কি রূপ গুণশালী, সে

নিজে তাহা কিছুই জানে না; এবং জড়েতে যে সকল গুণ ও রস আছে, তাহা তাহার নিজের কোন প্রয়োজনেও আইসে না। অথচ বিধাতা জড় রাজ্যে এত গুণ এত রস ছড়াইয়া রাখিয়াছেন কেন?" ইহা ভাবিলে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। ইহার প্রত্যেক গুণ ও রস মনুষ্যজাতির কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উদ্দীপক। জননীর স্তন্য হইতে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাণ্ড পদার্থনিচয় যতই চিন্তা করি, ততই দেখিতে পাই, ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদা আমাদিগের মস্তকোপরি প্রসারিত রহিয়াছে।

জড়ের গুণ ও রস সে নিজে অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং স্বয়ং যথোপযুক্ত মতে যোগ বিয়োগ করিয়া উপকৃতও হইতে পারে না। এই জন্য জড় জগতে কোন উপকার অপকার সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু জীবগণের উপকার অপকার সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে। জীবগণের মধ্যে জড়ীয় গুণ কার্য্য করিতে পারে সত্য, কিন্তু মনুষ্য ভিন্ন কোন জীব ইচ্ছা মত উপকার লাভ করিতে পারে না। জড়ীয় গুণ জ্ঞানসহযোগে প্রযুক্ত না হইলে সর্ব্বথা মন্দ ফল প্রসব করাই সম্ভব। জ্ঞানই জড়ের সম্পূর্ণ উপযোগিতার স্থল। জ্ঞান ব্যতীত জড় একেবারে অন্ধ ও অকর্ম্মণ্য। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে জড় পরাধীন। জড়ের যাহা কিছু কার্য্য জগতে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইবে তাহা সম্পূর্ণ পরাধীনতায়। ইহা বড়ই এক রহস্য যে যাহার গুণে কার্য্য হয় সে কিছুই নহে, কিন্তু অন্যে তাহার ফল ভোক্তা। অন্ধ যেমন নিজের বলে প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণে অসমর্থ, জড়ও সেই রূপ অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রযুক্ত না হইলে উপযুক্ত কার্য্য করিতে অসমর্থ।

পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অবসাদন ও উত্তেজন প্রভৃতি ভৌতিক পরমাণুর গুণ নানা স্থানে নানা ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগামী হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারা আমাদিগের কখন উপকার ও কখন অপকার হইয়া থাকে। কখন ওষধি সকলের প্রাণপোষক গুণ বায়ু জল প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া অশেষ মঙ্গল উৎপাদন করে, কখন তাহা প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। কখন বিদ্যুদালোকের সাহায্যে অজ্ঞাত পথ জ্ঞাত হয়; কখন সেই বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর শব্দে মূর্চ্ছা আনয়ন করে। কখন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, কখন এই সকল প্রাণপোষক বস্তুই বিষস্বরূপ হইয়া প্রাণ বিনাশ করে। যখন ভৌতিক বস্তু হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করে, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া আমরা অধোগমন করি, কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আর সেরূপ হইতে পারে না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত

হইয়াছে, ভূতের নিজের চিন্তা ভাবাদি নাই। ভৌতিক পরমাণুসকল অন্য প্রকৃতির অনুগত। জ্ঞানবলে প্রযুক্ত না হইলে তাহা হইতে অবিতথ মঙ্গল আসিতে পারে না। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে ভূতের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চেতনের। সুতরাং যাহার জ্ঞান আছে, প্রয়োজনও তাহারই আছে। যাহার প্রয়োজন সে অন্ধ নহে, প্রকৃতি অন্ধ। যাহার প্রয়োজন সে যদি অন্ধভাবে না চলে, তবে তাহার মঙ্গল অসীম। জগতে সকল ঘটনাই নিয়মানুসারে ঘটে। ভৌতিক বস্তু সুফল প্রসবু করে নিয়মে, আবার যখন দেখি তাহা হইতে কুফল জন্মিল, তখন বলি নিয়মের ব্যতিক্রমে। তবে কোথায় কি নিয়মে কোন ফল ফলিল, সে সকল অবগত হইবার শক্তি মনুষ্যের আছে। মনুষ্য জ্ঞানবলে সেই সকল নিয়ম হইতে আপন উপযুক্ত ফল বাহির করিয়া লইতে পারে। যে বিদ্যুৎ অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া লোকের প্রাণ বিনাশ করে, সেই বিদ্যুৎ জ্ঞানের আয়ত্ত হইয়া প্রাণ বিতরণ করে, এবং ভৃত্যবৎ দেশে দেশে সংবাদ বহন করে। যে বিষ অন্ধ ভাবে প্রযুক্ত হইয়া প্রাণ সংহার করে, সেই বিষ জ্ঞানপ্রভাবে প্রযুক্ত হইয়া প্রাণদান করে। অগ্নি বায়ু জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত হইলেও মনুষ্য ইচ্ছামতে তাহাদিগের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি; স্থল বিবেচনা করিয়া

প্রয়োগ ; এবং কথন নিষ্পেষণ, কথন বিলোড়ন, কখন সঞ্চালন, কখন সন্তপ্ত করিতে পারে। মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিতেছে তাহাতে তাহাদিগের এক বিন্দুও অনিচ্ছার ভাব নাই। যখন তাহারা মনুষ্যের অধীনতায় মনুষ্যের ইচ্ছামতে প্রযুক্ত হয়, তখনও তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে কিছুই করিতে পারে না। ভৌতিক বস্তু কোথায় কি ভাবে প্রযুক্ত হইলে কি ফল ফলিবে, মনুষ্য জ্ঞানবলে তাহা জানিতেছে এবং তাহাদিগকে আপন বশে রাখিয়া প্রয়োগ করিতেছে। সুতরাং সম্ভব ও আবশ্যকানুরূপ ফল পাইবার কোন বাধা জন্মিতেছে না।

যদি ভৌতিক বস্তু সকলের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিত. যদি তাহাদিগের জ্ঞান ও ভাব থাকিত, তবে কদাচ তাহারা অন্যের বলে চালিত ও প্রযুক্ত হইত না। সুতরাং তাহাদিগের সাহায্যে এখন জ্ঞানরাজ্যের সীমা যে পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে, এত দূর কখনও আশা করা যাইত না। ইহা দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে, জড় বস্তু অন্ধভাবে চিরকাল পরানুবর্ত্তন করিবে, মনুষ্য চতুরতা পূর্ব্বক তাহার ফলভোগ করিবে, এবং ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া ও অনন্ত মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অহর্নিশি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কেবল মৃৎপাষাণ প্রভৃতি বস্তুই যে পরাধীন, তাহা

নহে। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ সকলও এইরূপ। আশ্চর্য্য! যাহাদিগের জীবনমরণের সংবাদ পাওয়া যায়, অতি স্পষ্টরূপে যাহাদিগকে জীবিত থাকিতে ও মরিতে দেখা যায়, তাহারাও নিশ্চল, নিস্তব্ধ ও ইচ্ছাশূন্য। যদি ইহারা এরূপ না হইত, ওষধি, ঔষধ, মহাবৃক্ষ, ফল-বৃক্ষ, শাক ও সূপ প্রভৃতি দ্বারা আমরা এখন যত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, এত উপকার কখনই পাইতে পারিতাম না। আরও এক চমৎকার ঘটনা এই যে, যে বস্তু যত প্রয়োজনীয়, সে বস্তু তত সুলভ। যে বস্তু যত অল্প প্রয়োজনীয়, সে বস্তু তত দুর্লভ। লৌহ বড় প্রয়োজনীয়, অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে চলে না, এ জন্য তাহা অতি সুলভ। যত ব্যবহার করিতে পারি, ততই পাই। স্বর্ণ তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবল অলঙ্কার গঠন ও নানাবিধ চাক্‌চিক্যসাধন ও কখন কখন শরীর পোষ-ণের জন্য অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এ জন্য তাহা অতি দুর্লভ। বহু কষ্টে অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে। আবার যে দেশে যে বস্তুর সদ্ভাব অধিক, সে বস্তুর উপযোগিতাও সেই দেশে অধিক। বাদাম, পেস্তা, আকরোট প্রভৃতি উষ্ণতাসাধক, এ জন্য তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে না; ইক্ষু, আনারস প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশের প্রধান সামগ্রী। আবার

শীতকালে যে বস্তু জন্মে তাহা উষ্ণবীর্য্য, গ্রীষ্মকালের উৎপন্ন বস্তু শীতবীর্য্য। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, মনুষ্যজাতির অশেষ মঙ্গল সাধনই জড় জগতের প্রয়োজন। নাস্তিকেরা মানুন আর না মানুন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, জগতের প্রতিপরমাণু হইতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

জড় জগৎ কি? কোথা হইতে আসিল? কিরূপে অবস্থিত? ইহার স্বভাব ও প্রয়োজন কি? সংক্ষেপতঃ বলা হইল, এখন প্রাণিজগতের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণিজগৎ।

প্রাণিজগৎ কাহাকে বলে? যাহার প্রাণ আছে, তাহাকেই প্রাণিজগৎ বলা যাইতে পারে। প্রাণ কি? প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুকে প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। শরীরগামী এই বায়ুপঞ্চকের সমষ্টি সাধারণভাবে প্রাণ শব্দের বাচ্য। বায়ু নানাবিধ নাই, একই বায়ু স্থলভেদে বিভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, এবং সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু অবস্থান করে। আধুনিক পণ্ডিতগণ বায়ুর ভূতত্বের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রাণত্বও বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থের সহিত স্বরূপতঃ এক করেন নাই। প্রাণের কার্য্য দর্শনে তাহার একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বসাধক সংযোগ ও বিয়োগকর আন্তরিক দ্বিবিধ গতি তাঁহাদিগের মতে প্রাণ। ফলতঃ যেখানে ইন্দ্রিয়ের গমনের অধিকার নাই, সেখানে ওইরূপ লক্ষণ দ্বারা পদার্থ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। উদ্ভিদ হইতে সমুদায় জীবে এই প্রাণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহাই জড়ীয় উন্নতির চরম সীমা বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ চেতন ও অচেতন দুই শ্রেণীতে পদার্থ সকল বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্য পশু প্রভৃতি এক শ্রেণী ও বৃক্ষ প্রস্তরাদি সমুদায় অপর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। যথার্থরূপে বিভাগ করিলে, নিম্নতর উদ্ভিদ সজীব জড় এবং কীট, পতঙ্গ, গো, মনুষ্য প্রভৃতিকে সাধারণতঃ প্রাণী বলা যায়। কেন না উহাদিগের মধ্যে তারতম্যে চেতনের ক্রিয়া আছে। চেতনত্বসম্বন্ধে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কেন না আর সকলের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাতে তাহা আছে। তাঁহাতে জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, ভাব আছে, ইচ্ছা আছে। সুতরাং বোধবিশিষ্ট জ্ঞানী মনুষ্যদিগকে পশুপক্ষীর শ্রেণীভুক্ত করাতে মনুষ্যজাতির বিশেষ অগৌরব করা হইয়াছে। এই দোষপরিহারমানসে প্রাণিজগৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিত হইতেছে। ইহাতে উহার সাধারণ ভাবগুলি কিছু কিছু উল্লিখিত হইবে। পূর্ব্বকালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ জগৎকে চেতন অচেতন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগে পুরাণপ্রণেতাগণ পশু পক্ষীর পরলোক ও পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং মনুষ্যদিগকেও পাপ করিলে পশু প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইবার ভয় দেখাইয়াছেন। ঐ সকলের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিবার মানসেই প্রাণিজগৎ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় করা আবশ্যক, নতুবা প্রয়োজন ছিল না।

আমরা সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিয়া চিন্তা করিলে

দেখিতে পাই, সমস্ত জগতেই একটী আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতার ভাব আছে। সাধারণ জড় রাজ্যের বিষয় আলোচনা করিয়াও তাহার মধ্যে আমরা এই আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতা দেখিতে পাইয়াছি। অগ্নি, বায়ু, জল, ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকা হইতে লতা গুল্মাদি উৎকৃষ্ট ও উন্নত। মহাবৃক্ষ ও ফল বৃক্ষাদি গুল্মলতা প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট। আবার সে দিন আমরা যে মাংসভোজী বৃক্ষের কথা শুনিয়াছি, তাহা যে সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী হইতে উন্নত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপর প্রাণীদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও এই আপেক্ষিক উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাই। প্রাণীদিগের মধ্যে কীটজাতি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সকল কীট মনুষ্যের উদরে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা পচা ক্ষত, কিম্বা দুর্গন্ধময় বাষ্পমধ্যে জন্মে, তাহারা সকলেই এক রূপ। আবার বিছা প্রভৃতি সরীসৃপ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তদপেক্ষা টিকটিকী, গিরগিটী, সাপ, গোসাপ প্রভৃতি উন্নত। এইরূপ উন্নতির স্রোত বানর ও বনমানুষে গিয়া সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

চেতনা। পূর্ব্বে যে প্রাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে, উহাকে জীবনী শক্তি বলা যায়। চেতনা তদপেক্ষা উচ্চ। চেতনাশক্তিবলে জীবগণ জগতে ইচ্ছামতে বিচরণ করিতে পারে; এবং এই জন্য উহারা পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গের কৃপায় মনুষ্যের সঙ্গে সবর্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়বোধ। প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয় আছে, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, রসন, ঘ্রাণ ও স্পর্শন শক্তি আছে। কিন্তু ইহাদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতি যৎসামান্য। ইহারা ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল সামান্য ভাবে একটা বস্তু বলিয়া বুঝে মাত্র। এই ইন্দ্রিয়শক্তি, সকলের সমান নহে, কোন কোন পশু পক্ষী এই শক্তির তীক্ষ্ণতা জন্য সর্ব্বদা মনুষ্য সমাজে পূজিত। কুকুরের শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে একটী পতঙ্গ উড়িলেও তাহারা টের পায়, এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তুর গন্ধ পাইবামাত্র তাহাদিগের উদ্দেশে ধাবিত হয়। আবার জলৌকা প্রভৃতি অনেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ত কথাই নাই, অনেক ইন্দ্রিয়ই নাই। সর্পদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, এজন্য তাহারা চক্ষুঃশ্রবা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ ইতরপ্রাণীদিগের কাহার ইন্দ্রিয়শক্তি অধিক, কাহারও অল্প। আবার কাহার অধিকাংশ ইন্দ্রিয় নাই।

বুদ্ধি। ইতরপ্রাণিগণের বুদ্ধি আছে, কিন্তু অতি অল্প। যতটুকু হইলে তাহাদিগের চলিবার সম্ভব, ততটুকু মাত্র বুদ্ধি তাহাদিগের আছে। এই বুদ্ধিবলে ইহারা বাসস্থান নিরূপণ ও নির্ম্মাণ করে, ভাবী বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে, কখন কখন কৃতজ্ঞতা প্রতিহিংসা প্রভৃতিও প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং উপদিষ্ট কার্য্য

করিতে ও কথা শিখিতেও সক্ষম হয়; কিন্তু এই বুদ্ধির ভাগ সর্ব্বত্র সমান নহে। এমন কি; কোন কোন স্থানে একবারেই নাই বলিলে হয়।

ইচ্ছা। ইহাদিগের ইচ্ছা আছে। যখন ইন্দ্রিয়শক্তি আছে, তখন সুখ দুঃখ বোধ না থাকিলে চলে না। সুতরাং সুখের প্রতি ইচ্ছা, দুঃখের প্রতি অনিচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাদিগের ইচ্ছা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত নহে। উহা অন্ধ, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণের অধীন। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যে দিকে টানে, ইহারা সেই দিকেই যায়, তাহার বৈধাবৈধ বিবেচনা করিতে পারে না। পতঙ্গ সকল অগ্নির চাকৃচিক্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, হরিণ বংশীরব শুনিলে বিমুগ্ধ হয়, মৎস্যগণ মাংসখণ্ডাবৃত বড়িশ দেখিয়া প্রতারিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। কেবল প্রতারিত হয় তাহা নহে, প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়। অতএব ইহাদিগের বুদ্ধি ও তৎসহযোগিনী ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গণের অনুগত সুতরাং অন্ধ।

ইতর জন্তুদিগের চেতনা শক্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে আছে বলিয়া ইহারা কথা শিখিতে ও কার্য্য করিতে পারে। কথা শিখিবার সামর্থ্য পক্ষিগণের মধ্যেই প্রচুর। শুক ও সারী প্রভৃতি পক্ষিজাতি এই বাক্‌শক্তির জন্যই জগতে পূজিত। হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই আদৃত। কিন্তু ইহদিগের শিক্ষিত ভাষা ও কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার সীমার মধ্যে

পর্য্যবসিত। পশুপক্ষিপ্রভৃতিরা বড় সুশিক্ষিত হইলেও তাহাদিগের শিক্ষার যতটুকু সীমা চিরকাল তন্মধ্যে বিচরণ করিবে, শিক্ষিত ভাষা অতিক্রম করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। পশুরা বিবিধ কার্য্য করিতে পটু, পক্ষীরা নানাবিধ কৌশলময় বাক্য বলিতে পটু, ইহা অনেক স্থলে দেখা ও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এরূপ কখন দেখা কি শুনা যায় নাই যে তাহারা আপনার শিক্ষাপদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। পশুগণ প্রতিদিন কিম্বা প্রায়শঃ যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, অথবা কার্য্য করিতে দেখে, তাহাই করিতে পারে; পক্ষিগণ প্রতিদিন আপন প্রভু ও প্রভুর পরিবার মধ্যে যে সকল কথা শুনিতে পায়, অথবা যাহা বলিবার জন্য উত্তেজিত হয়, তাহা বলিতে পারে; কিন্তু সেই প্রদর্শিত সীমার এক বিন্দুও বাহিরে যাইতে পারে না। একটি শুক ও সারমেয় দস্যু গৃহে শিক্ষিত ও পালিত হইলে, তৎপরিবারোচিত ভাষা ও কথঞ্চিৎ কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু সেই শুক ও সারমেয় স্থানান্তরিত হইলে, নূতন স্থানোচিত ভাষা ও কার্য্যকলাপে মনোযোগ দিতে অসমর্থ। যে শুক কিম্বা সারিকা বৈষ্ণব গৃহোচিত শিক্ষা পাইয়াছে, সে শাক্ত গৃহে নীত হইলে আপনশিক্ষিত বিষ্ণু কৃষ্ণাদি নাম ভিন্ন অন্য নাম বলিবে না, এবং তাড়িত কিম্বা তিরস্কৃত হইলেও "বিষ্ণু আমার উপাস্য, আমি ঐ নাম পরিত্যাগ করিয়া

অন্য নাম বলিব না” বলিতে পারে না। অথবা যে কুকুর তস্করের গৃহে শিক্ষিত, সে চৌর্য্যের সাহায্য করিতে পারিবে; কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্মের সাহায্য করিতে পারিবে না। কেবল ইহাই বুঝিতে পারিবে না; তাহা নহে। তাহারা ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে পারিবে না। উচিত, অনুচিত, পাপ, পুণ্য, দণ্ড, পুরস্কার, সত্য, মিথ্যা, বস্তুগুণ, কার্য্যকারণ এ সকল কিছুই বুঝিবে না। কেন বুঝিবে না? জ্ঞান ভাবাদি নাই এই জন্য। সুতরাং সেই সকল কার্য্য করিবার প্রয়োজন কি? বিষ্ণু কৃষ্ণাদি নামই বা কেন উচ্চারিত হয়? শাক্ত মহাশয়েরই বা তাহাতে অরুচি কেন? সে তাহা জানে না এবং বুঝে না। কেবল স্বতই যে বুঝে না, তাহা নহে; বুঝাইলেও বুঝে না। একজন একটী পশুকে “পরের শস্য ভক্ষণে অপরাধ” বুঝাইলেন, বুঝিল না। প্রহার করিলেন, তবুও বুঝিল না। আবার পরের শস্য খাইল। কারণ কি? আত্মজ্ঞান নাই, সুতরাং মানাপমান বোধও নাই। আত্মা থাকিলেই আত্মাদর থাকে, আত্মাদর থাকিলেই মানাপমান বোধ থাকে। যখন আত্মা নাই, আত্মাদর নাই, তখন উন্নতি অবনতিও নাই। পশুদিগের, পক্ষীদিগের এবং অন্যবিধ প্রাণীদিগের মধ্যে সামাজিকতা আছে; কিন্তু তাহা কেবল প্রয়োজনীয় বস্তুসংগ্রহ, বিপদ হইতে আত্মমোচন ও বাসস্থান নিরূপণেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত সামাজিকতা

বলা যায় না। ঐ সকল কার্য্য তাহাদের প্রকৃতিমূলক বলা যাইতে পারে। তাহাদিগের যেমন প্রকৃতি, ঠিক সেই রূপে চলে, তাহার এক বিন্দুও অন্যথা করে না। আত্মা ভিন্ন প্রকৃতি ও শিক্ষার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার আর কাহারও সাধ্য নাই। বস্তুতঃ জ্ঞান, যাহা সমস্ত মোহান্ধকার বিনাশের একমাত্র সাধন; উদার প্রীতি, যাহা জগৎ ও ঈশ্বরের রসবত্তা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য গ্রহণে সমর্থ; স্বাধীন ইচ্ছা, যাহা সমস্ত পাপমলিনতার প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে সক্ষম, ইতর প্রাণীদিগের তাহা নাই, অতএব ইতর জন্তুদিগকে সাত্মক বলিলে বড়ই দোষ হয়। যাহার আত্মা নাই, তাহার উন্নতি অবনতিও নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সত্য মিথ্যা নাই, ইহকাল পরকাল নাই। ফলতঃ যাহার জন্য মনুষ্যের মহত্ত্ব তাহাদিগেতে তাহার কিছুই নাই।

যেমন এক দিকে তাহাদিগের অভাবের সীমা নাই, অন্য দিকে তেমনি তাহাদিগের সদ্ভাবও অনেক আছে। তাহারা আহার্য্য বস্তুর স্বাদ বৃদ্ধি করিতে পারে না, এজন্য স্বাদবৃদ্ধির প্রয়োজনও হয় না, স্বচ্ছন্দ অনায়াসলভ্য আহার্য্যে উদর পূর্ত্তি করে। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না, সুতরাং বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনও হয় না; ইহাদিগের দেহ, স্বভাবজাত নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণে সজ্জিত। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে ইহাদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা আছে। জগৎপাতার অব্যাহত নিয়মের

প্রসাদে, অক্ষুণ্ণ সমদর্শিতা ও বিচারশক্তির প্রসাদে, অনেক অভাব থাকিলেও অচলতা নাই।

ইহাদিগের যাহা আছে, তাহার উপযোগিতা আছে, যাহা নাই তাহার উপযোগিতাও নাই। ইহাদিগের কিয়ৎ পরিমাণে চেতনা, কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধি শক্তি নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইহাদিগের এই সকল বৃত্তি যথাযথ না থাকিলে সংসারের যত কার্য্য তাহারা এখন সম্পন্ন করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না। যদি অশ্বের চেতনা, ইন্দ্রিয়বোধ ও বুদ্ধি শক্তি না থাকিত, উহাকে যথানিয়মে পথের উপর দিয়া তীব্র বেগে চালান এবং পথবাহী অন্য পশু ও মনুষ্যকে তাহার পদ প্রহার হইতে রক্ষা করা দুষ্কর হইত। আবার রণক্ষেত্রের নির্ভীকত্ব ও গতিচাতুর্য শিক্ষা দিয়া আত্মরক্ষার সাহায্যও লওয়া যাইত না। এতদ্ব্যতীত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুকে এখন আমরা যেরূপ উপকারী বলিয়া বুঝিতেছি, এরূপ বুঝিতে কদাচ সমর্থ হইতাম না। বলদ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর যদি পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সকল যথাযথ না থাকিত, তাহারা এত কার্য্যসাধনোপযোগী কখন হইত না। আবার এখন তাঁহাদিগের যেরূপ অবস্থা ও যেরূপ স্বভাব আছে, তাহা অপেক্ষা তরতম হইলেও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল চলিবার পক্ষে বাধা জন্মিত। উন্নতিশীল জ্ঞান, উদারভাবগ্রাহিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি থাকিলে তাহাদিগকে বশে রাখিয়া

কার্য্য চালান দুষ্কর হইত। বশে রাখিতে না পারিলেও বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, আশী, নব্বই টাকায় বলদ ; শত সহস্র মুদ্রায় অশ্ব এবং দ্বি সহস্র বিশ সহস্র মুদ্রায় হস্তী ক্রয় করা বোধ হয় নিষ্ফল হইত। কোন কোন সম্প্রদায় পশু প্রভৃতিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কষ্ট দেওয়া পাপ মনে করেন। বস্তুতঃ যদি তাহাতে পাপ হওয়া স্বাভাবিক হইত, তবে তাহারা এরূপ কার্য্যোপযোগী হইত না। যখন তাহারা কার্য্যের উপযোগী, তখন কার্য্য করান ও তজ্জন্য কথঞ্চিৎ শ্রান্তি প্রদান পাপ নহে। তবে নিষ্ঠুরতা অবশ্যই পাপ। যে সকল প্রাণী দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ, যাহাদিগের কার্য্য করিবার বস্তুতঃ সামর্থ্য নাই, যাহারা আপন শরীরের গুরুত্ব বহন করিতেই অসমর্থ, অর্থের লোভে তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা ও মরণোপম যন্ত্রণা দেওয়া অবশ্যই পাপ। নতুবা কেবল কার্য্য করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের পক্ষেও কার্য্য করা পাপ হইতে পারে। যখন শরীর আছে, যখন শরীরের বল ও স্পর্শ শক্তি আছে, তখন কথঞ্চিৎ শ্রান্তি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাদৃশ শ্রম উপকারী ব্যতীত অপকারী নহে। কেন না শ্রম দ্বারা শারীরিক রক্ত ও মাংস প্রভৃতি উপাদান সতেজ হয়। সুতরাং দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। শ্রম করা আবশ্যক জন্যই কৃপানিধান পরমেশ্বর তাহার উপযোগিতা দিয়াছেন। নতুবা এরূপ উপযোগিতা থাকিত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

অধ্যাত্ম জগৎ।

অধ্যাত্ম জগৎ কি? যে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মা প্রধান এবং আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই আর সকল বসতি করে, তাহাকেই আমরা অধ্যাত্ম জগৎ বলিব। আত্মা কি? এ প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। জগতে এরূপ কোন পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা আত্মার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। জগতে যত ভৌতিক উপাদান আছে, তাহার কোন উপাদানে আত্মা নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং আত্মার পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সাহায্য পাইবার আশা নাই। এই জন্য আমরা আত্মসম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মাত্র বলিতে পারি। যথা—জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনটি আত্মার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ; অথবা এই তিনটিকে আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই তিনটি লক্ষণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাই আত্মা শব্দে অভিহিত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই লক্ষণত্রয় কিসে অবস্থান করে? ইহার উত্তরে আমরা এইরূপ বলিব, আত্মাতে। বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধনির্ব্বাচন শক্তির নাম জ্ঞান; হর্ষ শোকাদি রসগ্রাহিতার নাম ভাব, এবং কার্য্যে প্রবর্ত্তিনী শক্তির নাম ইচ্ছা। জ্ঞান আত্মাকে বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধের কথা বলিয়া দেয়, ভাব তাহার মধ্যে রসালতা দোহন

করিতে নিযুক্ত হয়, এবং ইচ্ছা সেই সম্বন্ধ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া যখন বিমুগ্ধ হয়, তখন আত্মাকে কার্য্য করিবার জন্য উত্তেজিত করে। সুতরাং ইহাই সত্য যে এই লক্ষণত্রয় যাহার আছে, তাহাই আত্মা। জিজ্ঞাসু পাঠক! তুমি যদি ইহাতে আপত্তি কর, যদি বল "আমাকে স্পষ্টরূপে না দেখাইলে মানিব না।" তবে আমি বলিব "জগতে যাহা লক্ষ্য বা বিশেষ্য ভাবে খ্যাত, তাহার একটিকেও স্পষ্টরূপে বুঝাইবার উপায় নাই। সকলকেই লক্ষণ বা বিশেষণ দিয়া বুঝিতে হইবে। কেন না জগতে এরূপ কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর সমান হইতে পারে। যেমন আম্র একটি বিশেষ্য বস্তু; কিন্তু আম্রের সমান, আম্র ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেইরূপ কোন বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে অন্য বস্তুর সমান হইলে, তাহার পার্থক্য রহিল কৈ? যদি পার্থক্য কিছুই না থাকিল, তবে অন্য বস্তুর সমান, সুতরাং সে বস্তু এ বস্তু একই হইয়া যায়। মনে কর, যে ব্যক্তি হস্তী কিরূপ জানে না, তাহাকে হস্তী বুঝাইতে হইবে। তখন তুমি কি করিবে? তুমি হয়ত, একটি হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি এক খানি ফলকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবে; অথবা তুমি যদি আরও নিপুণ হও, এবং অধিক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাও, তবে না হয় মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ লইয়া একটি সুন্দর হস্তীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেখাইবে। কিন্তু তাহাতে হস্তী দেখান হইল কৈ? সে কেবল হস্তীর আকার

দেখান হইল। অতএব পুনর্ব্বার তোমাকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও স্বভাবের লক্ষণ করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণরূপে হস্তী বুঝাইতে পারিবে না। আর যদি যথার্থ হস্তী আনিয়া দেখাও তবে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পার। সুতরাং হস্তীর অনুরূপ হস্তী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিল না। এই জন্য আমরা বলি,আত্মার অনুরূপ আত্মা ভিন্ন'আর কিছুই নাই।

এখন মনে কর, হস্তীর যেমন পার্থিব শরীর মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক অমূর্ত্ত কোন বিষয় দেখা যায় না, সেইরূপ আত্মাও অতীন্দ্রিয় অমূর্ত্ত বস্তু, সুতরাং তাহা দেখাইবার কোন উপায় নাই। জড় বস্তুতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি যে শক্তি আছে, তাহা দর্শনাদির অনায়ত্ত,সুতরাং তাহার কার্য্য ও লক্ষণাদিকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাহা বুঝিয়া থাকি। অতএব অমূর্ত্ত বস্তু জানিতে হইলেই কেবল লক্ষণ ও কার্য্য ধরিয়া জানিতে হইবে*। তবে অমূর্ত্ত ও

* একটু গভীররূপে চিন্তা করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, যে সকল বস্তু আমরা দেখি, তাহার কেবল গুণ অনুভব করি, কিন্তু প্রকৃত বস্তু দেখিতে পাই না। জড় পদার্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেও আমরা কেবল কতক গুলি লক্ষণমাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি, তদ্ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি না। আত্মা অদৃশ্য বলিয়া যাঁহারা তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অদৃশ্য শক্তি ও প্রাণ সম্বন্ধে কি বলিবেন? আমাদের অনুভব অতিরিক্ত জড় বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কোন কোন দার্শনিক এই জন্য জড়

অতীন্দ্রিয় আত্মাকে লক্ষণ ধরিয়া বুঝিলে বাধা কি? অতএব আমরা বলিব, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণত্রয় যাহার আছে, তাহাই আত্মা। কেহ কেহ জ্ঞান ভাব ইচ্ছার সমষ্টিকেই আত্মা বলেন। যাহারা এরূপ বলেন, তাহাদিগকে আমি দোষ দিতে চাই না, কিন্তু আমার নিকট উহা সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না।

কেন না জ্ঞান যে বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধের কথা বলে তাহা শুনে কে? ভাব যে রসালতা বুঝাইয়া দেয়, তাহা গ্রহণ করে কে? এবং ইচ্ছাই বা কার্য্য করিবার জন্য কাহাকে উত্তেজিত করে? যেমন দয়া, ভক্তি, স্নেহ আত্মা নহে, কিন্তু আত্মার বৃত্তি; সেইরূপ জ্ঞানভাবাদিও আত্মা নহে, কিন্তু আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; সুতরাং আত্মাতেই অবস্থান করে, এবং যাহার যেমন স্থল, পাইলেই কার্য্য করে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী সম্প্রদায় বলেন, মানবদেহে আত্মা বলিয়া দেহাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। দেহে যে জড়ীয় উপাদান সকল আছে তাহাদিগের পরস্পর সংযোগেই চৈতন্য জন্মে, এবং অজ্ঞ লোকেরা এই চৈতন্য শক্তিকেই আত্মা বলে। আত্মা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট

পদার্থকেও মনোভাব মাত্র বলেন। তাঁহাদের যুক্তিকে এ পর্য্যন্ত কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই, খণ্ডন করিবার সম্ভাবনাও নাই।

বস্তু হয়, তবে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকা আবশ্যক। যদি আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্বীকার করা যায়, তবে যে স্থানে আত্মা অবস্থান করে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বোধ-শক্তি না থাকা সম্ভব; কিন্তু তাহা হয় না। আবার আত্মাকে সর্ব্বশরীরগামী বলিলেও দোষ হয়। কেন না তাহা হইলে তাহার নির্দ্দিষ্ট বস্তুত্ব থাকে না। শরীরের কোন সামান্য অংশ অর্থাৎ হস্তপদাদি ছেদন করিলে সজীব থাকা অসম্ভব। অপিচ মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার কি বিধানবিকার ঘটিলে, মনুষ্য মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক সুস্থ ও সক্রিয়, সে কেমন সুন্দর? সে কেমন আশ্চর্য্য ভাবে সদসৎ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ? সে কেমন চমৎকার ভাবে জ্ঞান গর্ভ উপদেশ দিয়া লোকের হৃদয় মন আকর্ষণ করে? আবার সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে আত্মহত্যা ও অগম্যাগমন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। যখন শরীরের প্রধান অংশ মস্তিষ্ক বাঁচাইয়া সামান্যাংশ হস্তাদির ছেদনে, মনুষ্যত্বের ব্যাঘাত জন্মে না, এবং মস্তিষ্ক সুস্থ ও সক্রিয় থাকিলেই আত্মা বাঁচিল, মস্তিষ্ক অসুস্থ ও বিকৃত হইলেই আত্মা মরিল, তখন মস্তিষ্ককেই আত্মা বলিতে বাধা কি? অর্থাৎ লোকে যাহাকে আত্মা বলে তাহা কোন বস্তু নহে; কিন্তু মস্তিষ্কের গুণ। আবার বিজ্ঞানপ্রসাদে জানা যাইতেছে যে, কোন প্রকার জড়ীয় পরমাণু যন্ত্রযোগে মৃতপ্রায় দেহে প্রবেশ

করাইতে পারিলে সেই মৃতপ্রায় দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ সঞ্চার হয়। যদি জড়ের অভাবে মনুষ্য জীবন হারাইল, এবং জড়ের সংযোগসাধন ব্যতীত আত্মার অন্য প্রমাণ না থাকিল, তবে আর শরীরাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার কেন ?"

যাঁহারা এই সকল আপত্তি আনিয়া আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যে কারণে ভ্রান্ত বলা হইল, ক্রমশঃ সেই কারণ সকল প্রদর্শিত হইতেছে।

আপত্তিকারীদিগের প্রথম কথার উত্তর এই—আত্মা নিরাকার। আকারবিশিষ্ট পদার্থেরই স্থানব্যাপ্তি নিরূপণ আবশ্যক, আত্মাকে দেহব্যাপী চৈতন্যই বল, আর মস্তিষ্ক ব্যাপীই বল কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। যাহা জড় নহে, জড় অঙ্গচ্ছেদে তাহার বিনাশ সম্ভাবনা কোথায় ? যদি আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান মস্তিষ্ক বলা যায়। তাহা হইলে অগ্নি যেমন লৌহের এক প্রান্তে সংলগ্ন হইলেই অপর প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়া ক্রিয়া প্রকাশ করে, আত্মাও সেইরূপ মস্তিষ্কে থাকিয়াই সর্ব্বেন্দ্রিয় কিম্বা সর্ব্বশরীরগামিনী ক্রিয়া অনুভব করে বলিতে পারা যায়। হস্তপদাদি শরীরের কোন সামান্যাংশ ছিন্ন হইলেও আত্মা নির্ব্বিঘ্ন। আবার মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আহত হইলেও আত্মার নির্ব্বিপন্নত্ব অসম্ভব হয়, ইহা শরীরের ধর্ম্ম আত্মার নহে। শরীর বিনাশে কাজেই আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া ঈশ্বরের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় কথার উত্তর এই—নিরাকার আত্মার ইহ-লৌকিক কার্য্যসাধনের জন্য শরীর চাই। আত্মার যে সকল কার্য্য পৃথিবীতে প্রকটিত হয়, তাহা শরীর যোগে। শরীর ব্যতীত পৃথিবীর কোন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যদি অসম্ভব না হইত, তবে শরীর থাকিত না; আত্মা স্বতঃ কার্য্য করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ নিয়মে আত্মাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আত্মার সমুদায় ইহলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপায়-স্বরূপ শরীর প্রদান করিয়াছেন; এবং বাহিরের পদার্থ সকলের সহিত সেই শরীরের উপযোগিতা রক্ষা করিয়া-ছেন। সুতরাং শরীরযোগে কার্য্য হওয়া বিধাতার নিয়ম; অন্যথা নিয়ম ভঙ্গ হইবেক। নিয়ম ভঙ্গ হইলে কার্য্য চলিবে না। ঐশিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে, কাহার সাধ্য? অতএব আত্মা যখন যাহা চিন্তা করে, মস্তিষ্কের পরমাণু সকলের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া বাক্যে তাহা আবির্ভূত হয়, অথবা চক্ষুরাদি অন্যবিধ যন্ত্রে বিস্ফুরিত হয়। আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয় চিন্তা করি, কিন্তু কাহার সাধ্য না বলিলে তাহা বুঝে? সে চিন্তার ভাব বদনে যদিও অল্পমাত্র সূচিত হয়, তাহাও জড়ীয় যোগ। অতএব কেবল মস্তিষ্ক নহে, সমস্ত শরীরের পারস্পরিক যোগাকর্ষ-ণাদি যত ক্ষণ সুচারুরূপে চলিতে থাকে, তত ক্ষণ আত্মারও ক্রিয়া সুস্থতাসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। নতুবা যাহার

যোগে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে উহা অসুস্থ ও বিকৃত হইলে ক্রিয়া চলিতে পারে কি রূপে? শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। এই শরীর যন্ত্র দ্বারা আত্মা কার্য্য করিবে; ইহা বিধাতার নিয়ম। সুতরাং মস্তিষ্কাদি যন্ত্রীয় অঙ্গ বিকৃত হইলে যন্ত্রী আত্মারও পরিষ্কৃত জ্ঞান, সুপবিত্র ভাব ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রভৃতি ক্রিয়া চলিতে পারে না। বংশী ভগ্ন হইলে বংশীবাদক চেষ্টা করিয়া কি সেইরূপ মধুর ধ্বনি করিতে পারেন? আপত্তিকারী বলেন, "শরীর বিকৃত কিম্বা শরীরের প্রধান অংশ মস্তিষ্কাদি বিকৃত হইলে, আত্মা বিকৃত হয় কেন? যদি শরীর হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, তবে শরীর বিকৃত হইলেও আত্মা অবিকৃত থাকুক।" আমরা বলি, বস্তুতঃ তাহাই হয়, শরীর বিকৃত বা বিধ্বস্ত হইলেও আত্মা অবিকৃত ও অবিনাশী থাকে। কেবল বিকৃত বা বিনষ্ট শরীরে আত্মার ক্রিয়া অচল হয় মাত্র। যেমন বংশী-বাদক অবিকৃত থাকিয়াও বংশীর বিকৃতিজন্য কার্য্য করিতে অক্ষম, সেইরূপ। শরীর, আত্মার কার্য্য সাধনো-পযোগী যন্ত্র। মস্তিষ্ক সেই যন্ত্রের প্রধান অংশ। কেননা যে কার্য্য বাহিরে সঞ্চারিত হয়, তাহা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া ভিন্ন সঞ্চারিত হইবার পথ নাই। যাহা হউক, বংশী যন্ত্রের উপরে বাদকের কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব চলে, যেহেতু সে যন্ত্র তাঁহার স্বকৃত, কিন্তু শরীর যন্ত্রের উপর আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যেহেতু শরীর ঈশ্বরদত্ত। সুতরাং শরীর ভগ্ন

হইলে আত্মা তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ। এইরূপ মাদক-সেবী প্রমত্ত কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ ভাব ও ইচ্ছা তাহার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই জন্য কি আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব হইতে পাবে? কখনই না। জগতে যত প্রকার জড়ীয় পরমাণু আছে, তাহার একটিতেও জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা নাই। সুতরাং জড়ের সংযোগবিয়োগে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাহাও জড় হইবে। তাহাতে চেতনের লক্ষণ থাকিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যত জড়ীয় গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এক টিতেও চেতনের চিহ্ন মাত্র নাই। গুড় কিম্বা দ্রাক্ষা রস হইতে যে মাদকতা জন্মে তাহা জড়। উদজন ও অম্লজন যোগে জল হইয়াছে, তাহাও জড়। চূণ হরিদ্রা যোগে যে রক্তবর্ণ হয় ও পারদ এবং গন্ধক যোগে যে হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়, সকলই জড়। জড়ের গুণ জড় বৈ জ্ঞান হইতে পারে না। জড় হইতে কিরূপে যে জ্ঞান ভাবাদি উৎপন্ন হইবে, আপত্তি কারিগণ কি তাহার উত্তর দিতে পারেন? যাহারা পৃথক পৃথক অবস্থায় অজ্ঞান ছিল, সংযুক্ত হইয়া তাহারা কিরূপে সজ্ঞান হইবে? ইহা কি মনে কল্পনা করিতেও সাহস জন্মে?

তৃতীয় কথার উত্তর এই—জড়ীয় পরমাণুগুণে মানব শরীর কার্য্যক্ষম থাকে; এবং কোন বিশেষ অংশের বিয়োগ

হইলে শরীর বিনষ্ট হইয়া যায় ; কেননা শরীব জড়। সুতরাং যে যে বস্তুর সংযোগবিধানে তাহা কার্য্যোপযোগী থাকিবে, তাহা চাই, অভাব হইলে চলিবে না। আত্মা জড় নহে, সুতরাং শরীরের ক্ষতিতে আত্মার অল্প মাত্রও ক্ষতি নাই। বিদ্যুতের অভাবে যাহার শরীর বিনষ্ট হইতেছিল, বিদ্যুৎ প্রয়োগে পুনর্ব্বার তাহা আত্মার কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। ভয়ঙ্কর বিষদুষ্ট বায়ুতে যাহার শরীর ভঙ্গ হইতেছিল, তৎ প্রতীকারক ঔষধের গুণে তাহা সুস্থ ও সক্রিয় হইতে পারে। সর্পাদির বিষ দ্বারা হতচেতন মুমূর্ষু ব্যক্তি জলসেক কিম্বা অন্যবিধ জড়শক্তি প্রভাবে সুস্থ হইতে পারে। কেন পারে ? ঐ সকল বস্তু জড় এবং শরীরও জড়, সুতরাং জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইলে কার্য্যকর হইবে। কিন্তু আত্মা জড় নহে, এ জন্য আত্মার কোন ক্ষতি হইতে পারে না ; কিন্তু আত্মার ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে মাত্র। অতএব বিদ্যুৎ বিষঘ্ন দ্রব্য কিম্বা সলিলাদি স্বতন্ত্র, আত্মা স্বতন্ত্র। জড়ে জ্ঞান ভাবাদি নাই, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা আসিবে কি রূপে ? যদি বিদ্যুৎ প্রভৃতি জড় বস্তুতে জ্ঞান ভাবাদি থাকিত, তবে তাহারাও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মত কখন ঈশ্বরকে স্বীকার, কখন অস্বীকার করিতে পারিত। তাহারাও "এমত সত্য নহে" বলিতে পারিত, এবং ঈশ্বর, পরকাল, বস্তুগুণ ও কার্য্যকারণ প্রভৃতি লইয়া বিতণ্ডা করিতে অগ্রসর হইত।

অধিকন্তু পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহাদিগের উপকার অপকার সম্বন্ধও থাকিত। সুতরাং জড় বস্তুতে জ্ঞান ভাবাদি আছে ইহা স্বীকার করা ভ্রম। যদি জ্ঞান ভাবাদি স্বীকার করা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, "তবে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন" বুঝিবার বাকি রহিল কি? আর এক কথা এই, যে স্থানে আত্মা আছে, সে স্থানেই আত্মজ্ঞান আছে; যে স্থানে আত্মা নাই, সে স্থানে আত্ম-জ্ঞানের চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। এ জন্য চেষ্টা করিলেও পশুর আত্মজ্ঞান জন্মান ও মনুষ্যের আত্মজ্ঞান দূর করা যায় না। আমি বুঝিতেছি, আমি আছি, এ জ্ঞান মানুষের সহজ। আমি বুঝিতেছি, আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, অনুমন্তা, তুমি যদি যুক্তি দ্বারা ইহা খণ্ডাইতে চাও, তাহা কি পারিবে? আমার আত্মজ্ঞানে কখন অবিশ্বাস জন্মা-ইতে পারিবে না; আমার জ্ঞান ভাবাদি রহিত করিতে পারিবে না। যে স্থানে জ্ঞান ভাবাদি আছে, সে স্থানে তোমার কোন যুক্তি খাটিবে না; আর যে স্থানে নাই, সে স্থানেও তোমার চেষ্টা কার্য্যকারী হইবেক না। পশুর আত্মজ্ঞান নাই, ঈশ্বর পরকাল নাই, সত্যাসত্য নাই, তুমি কি তাহা তাহাদিগকে আনিয়া দিতে পার? তুমি কি পশুকে বস্তুশক্তি বুঝাইয়া তদনুরূপ শিক্ষা দিতে পার? তুমি কি পশুর নৈসর্গিক সংস্কার বিরুদ্ধে তাহাকে এক পদও অগ্রসর করিতে পার? কখনই না। যদি পশুর আত্মজ্ঞান

থাকিত, তবে দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ হইত ; পশুর প্রতি রাজদণ্ড ব্যবস্থিত হইত ; এবং হন্তা পশুর কারাবাস করিতে হইত। তাহা হয় না কেন ? পশুর জ্ঞান নাই, সুতরাং তৎকৃত দুষ্কর্ম্ম সজ্ঞানকৃত হয় না। সজ্ঞানকৃত অপরাধ না হইলে দণ্ড হয় না, এবং হইয়াও কোন ফল নাই। কেননা দণ্ডবিধান দণ্ডিত ব্যক্তির শিক্ষার জন্য। কিন্তু সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিলেও পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণের শিক্ষা হইতে পারে না। অতএব নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে, মনুষ্য দেহে আত্মা বিদ্যমান।

আত্মা অপূর্ণ। জড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আত্মাকে সদ্ভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃও আত্মা জড় অপেক্ষা সদ্ভাবান্বিত। জড়ের জ্ঞান নাই, আত্মার তাহা আছে। জড়ের আত্মজ্ঞান নাই, আত্মার আছে। জড়ের ঈশ্বর পরকাল বোধ নাই, আত্মার আছে। জড় অন্ধ, আত্মা চক্ষুষ্মান। জড়ের ইচ্ছা, যত্ন ও অধ্যবসায় নাই, আত্মার আছে। কিন্তু যেমন এক দিকে আছে, তেমনি অন্য দিকে নাই। জ্ঞান আছে, বুঝিতে পারে, কিন্তু সকল বুঝে না, কিছু বুঝে, আবার কিছু বুঝে না। প্রীতি পবিত্রতা আছে ; কিন্তু তাহা তেমন প্রশস্ত নহে ; সকল দিকে সমান প্রীতি ও সমান পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে কখন প্রীতি কখন বিদ্বেষ, কখন পবিত্রতা কখন অপবিত্রতা দর্শন করা যায়। উহা যেমন চক্ষুষ্মান্, তেমনই অন্ধ। এক বিষয়ের

এক দিক্ দেখিতে পায়, অপর দিক্ দেখিতে পায় না। সুতরাং আত্মার সকল বিষয়েরই পরিমাণ আছে। উহার কিছুই অসীম নহে, সকলই সসীম। এই সীমা অতিক্রম করিলেই পাপ জন্মে। সুতরাং সর্ব্বদা আপন সীমাতে থাকিবার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। আত্মা যদি অসীম গুণ যুক্ত হইত, তবে সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল না, উহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকিত। এখন পৃথিবী যেরূপ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, এরূপ হইত না, এবং মানুষ না বুঝিয়া কিছুই করিত না। বিষদুষ্ট অন্ন পানাদি আহার করিয়া পীড়িত হইত না, সুবায়ু ও বিষদুষ্ট বায়ু কোথায় কখন প্রবাহিত হইবে, অগ্রেই জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারিত; অকাল মৃত্যু, অকাল জন্ম, গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা দ্বারা মনুষ্য জাতির বর্ত্তমানানুরূপ ক্লেশ কদাচ হইতে পারিত না; রোগ হইলেও চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না; এবং নানা বিধ বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। শারীরবিজ্ঞান ভূতত্ত্ববিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার জন্য মনুষ্য কদাচ ক্লেশ পাইত না। অতএব আত্মা সদ্ভাবান্বিত হইলেও অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার জন্যই তাহাকে অন্যের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। এই জন্যই সে একেবারে সকল বিষয় বুঝিতে ও সকল কার্য্য করিতে পারে না। এই জন্য সকল দিক্

দেখিয়া আপনাকে নির্দ্দোষ রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য একাকী এক স্থানে বাস করাও কষ্টকর। এই জন্য সে আপন প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্য গুলিও কেবল আপনার যত্নে প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্য সমাজ চাই, বন্ধু বান্ধব চাই, নতুবা চলে না। পদে পদে পাপের আবর্ত্তে পড়িবার আশঙ্কা আছে। পদে পদে সাংসারিক ও পারত্রিক বিঘ্ন বিপত্তি ও ক্লেশ কল্পনা আসিতে পারে।

আত্মা আশ্রিত।—জগতের একটী বস্তুও নিরাশ্রয় নাই, সকলই আশ্রিত। সেই রূপ আত্মাও আশ্রিত। আশ্রয় ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও উহা অবস্থান করিতে পারে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ জড়ের আশ্রয়, যেমন উত্তর মেরু চুম্বকের আশ্রয়, যেমন লৌহ বিদ্যুতের আশ্রয়, সেই রূপ ঈশ্বর আত্মার আশ্রয়। এ জগতের কোন বস্তু দ্বারা উহার অভাব দূর হইতে পারে না; এবং জগতের ক্ষতিতেও উহার কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং জড়ীয় পরমাণু কিম্বা তাহার সংযোগ বিয়োগাদি উহার আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব আপাততঃ আমরা আত্মাকে শরীরধারী বলিয়া বুঝিলেও শরীর উহার আশ্রয় হইতে পারে না; অথচ উহা অপূর্ণ। পদে পদে আত্মা অভাবে জড়িত হইতেছে, এবং নিজের বলে তাহার প্রতীকার করিবার সাধ্য নাই। পদে পদে আত্মা স্খলিত ও পতিত হইতেছে, পদে

পদে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হইতেছে, সুতরাং আশ্রয় না থাকিলে তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। যদিও উহার বল অতি অল্প, যদিও উহা শোক মোহাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিরাশ হয়, যদিও তাহার প্রতীকার করিতে গিয়া সে প্রায়শঃ হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আইসে, তথাপি যত ক্ষণ সে পূর্ণ মঙ্গলের আধার ঈশ্বরেতে অবস্থান করে, যত ক্ষণ সেই মঙ্গলময় পিতা ও স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া থাকে, তত ক্ষণ উহার ভয় নাই, বিঘ্ন নাই, আপদ্ নাই, এবং পড়িবার বা মরিবার সম্ভাবনা নাই। শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে থাকিতে পারিলে ভয় করে না; আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরের চরণে স্থান পাইলে নির্ভয়ে থাকে। আত্মা যদি নিজের বলের প্রতি নির্ভর করে, আত্মা যদি আপনার বলের পরিমাণ না বুঝে এবং নিজের দুর্ব্বলতার পরিমাণ বুঝিয়া যদি সেই অচ্যুত অক্ষয় অচল পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ না করে, যদি সর্ব্বতোভাবে নিজের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার বাঁচিবার আর উপায় থাকে না। অন্য দিকে আবার ঈশ্বরের করুণাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে পারিলে আর পতনের ভয় নাই। আমরা যদি সাধুদিগের জীবন লইয়া আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, সংসারে তাঁহাদিগের হিতৈষী কেহই নাই, উপকারী বন্ধু নাই, সকলেই শত্রু। পৃথিবীর লোকেরা সাধুদিগকে পদে পদে নির্য্যাতন করিতে

চেষ্টা করিয়াছে, পদে পদে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়াছে, তাঁহাদিগের শোণিত পান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; তথাপি তাঁহাদিগের আত্মার ঔজ্জ্বল্য, মহত্ত্ব এবং অমৃতত্ব বিনষ্ট করিতে পারে নাই কেন? তাঁহারা ঈশ্বরের আশ্রিত, তাঁহারা বাহিরের লোকদিগকে ভয় করেন না, বাহিরের প্রলোভনকে তুচ্ছ মনে করেন, এবং কখনও আপন আশ্রয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারের অনুসরণ করেন না। এই জন্য তাঁহারা কখন পতিত, ভ্রষ্ট, নিরাশ বা নিরুদ্যম হন না। নির্ভয়ে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকেন।

আত্মা পবিত্র।—আত্মা পবিত্র, এ কি কথা? সংসারে পবিত্রাত্মার প্রমাণ কোথায়? এত পাপ এত জঘন্যতা যাহাতে, সে কি আবার পবিত্র? যদি এত পাপী আত্মা পবিত্র, তবে অপবিত্র কে? প্রিয় ভ্রাতঃ, তুমি আত্মার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, উহার স্বরূপ ও লক্ষণ গুলি সুন্দর করিয়া পাঠ কর, দেখিবে উহা পবিত্র। ঈশ্বর যে অবস্থায় উহাকে সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থা সম্মুখে ধরিয়া দেখ, উহা পবিত্র। বস্তুতঃ উহাতে পাপ মলিনতার লেশ মাত্র ও নাই। জ্ঞান বিবেক আত্মার মন্ত্রী, আত্মা দেহ-রাজ্যের রাজা। উহারা কি সৎ কি অসৎ উহাকে বলিয়া দেয়। ভাব সেই মন্ত্রীর অনুবর্ত্তী ও সহকারী, সে বিষয়ের মধ্যে রসালতা অন্বেষণ করে। ইচ্ছা ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী

হইয়া আত্মাকে কার্য্যের জন্য পরিচালিত করে। এই বৃত্তি তিনটী অবিকৃত থাকিলে আত্মাতে অপবিত্রতা আসিবার আশঙ্কা নাই। ইহাই উহার স্বাভাবিক অবস্থা। জ্ঞান বিবেক প্রকৃতিস্থ থাকিলে ভাল মন্দ অনায়াসে বুঝা যায়। ভাব যদি অবিকৃত ভাবে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, তবে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পবিত্র, যাহার তুল্য সুন্দর ও বিশুদ্ধ বস্তু নাই, তাহারই প্রতি উহাকে আসক্ত করিবে। ইচ্ছা এই আসক্তির সহায়তায় অনায়াসে উহাকে জ্ঞান বিবেকের উপদিষ্ট পথে পরিচালিত করিবে। তবে আর পাপ আসিবে কিরূপে? ফলতঃ আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন উহাতে পাপ নাই, মলিনতা নাই, কলঙ্ক নাই, এবং অপবিত্রতার চিহ্নমাত্রও নাই। তবে এরূপ বিশুদ্ধ আত্মাতে এত অপবিত্রতা কেন? যখন উহার স্বভাব বিকৃত হয়, তখন উহা সংসারের নানা কৃত্রিমতাতে পড়িয়া আপনাকে আপনিই ভুলিয়া যায়, এবং জ্ঞান অন্ধভাবে কার্য্য করে, সুতরাং আত্মাকে মলিন ও অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রমাণ দিবার জন্য, আমরা শিশুর পবিত্র ছবি, বিপন্ন ব্যক্তির কাতরতা ও কাকুপূর্ণ বাক্য, মৃত্যুশয্যায় শয়িত ব্যক্তির আত্মগ্লানিপূর্ণ হৃদয়ের ভাব ও ঋষিদিগের আশ্রমস্থ পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিতে পারি। প্রিয়তম, তুমি সর্ব্বদা যে সকল শিশুকে দেখিতে পাও, তাহাদিগের মধ্যে কি অপবিত্রতা দেখিয়াছ? শিশু কি সংসারের মান সম্ভ্রম

বুঝে? শিশু কি রাজার অনুরোধ, পিতা মাতার অনুরোধ অথবা সাংসারিক বিষয়ানুরোধে আপনার যাহা করিবার তাহা ভুলে? শিশুর সরলতা, শিশুর মাধুর্য্য, শিশুর সুস্নিগ্ধ ও সহাস্য বদন কেমন পবিত্র। শিশুর স্বাধীন ও নির্ভীক চিত্ত দেখিয়াছ কেমন মনোহর! তাহার যাহা ইচ্ছা হয়, সে যাহা বুঝে, তাহাই করে। যাহা জানে তাহাই বলে, তাহার বাহিরে যায় না। শিশুর জ্ঞান যত টুকু পরিস্ফুট, সে তত টুকু কার্য্য করে। সংসারের অনুরোধে তাহার বিপরীত করে না। শিশুর প্রেম কেমন নিরপেক্ষ? শিশুর দয়া কেমন অব্যাহত? শিশুর কার্য্য কেমন স্বার্থপরতা-শূন্য? শিশুর জ্ঞান অপরিস্ফুট; তথাপি তাহার ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞানের অনুবৃত্তি পরিত্যাগ করে না। যদি ক্রমশঃ জ্ঞানপরিস্ফুটের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ইচ্ছা তাহার অনুগত থাকে, যদি সংসারের কৃত্রিমতা প্রথম হইতে তাহাকে আশ্রয় করিতে না পায়, তবে কি মানব আত্মাতে কোন কালেও অপবিত্রতা আসিতে পারে? আশ্রমবাসী ঋষিগণ সর্ব্বদা কপটতা, ছলনা, চাতুরী প্রভৃতি সাংসারিক আকর্ষণ হইতে দূরে অবস্থান করেন, এই জন্য তাঁহাদিগের জীবন অনেকাংশে পবিত্র। তথাপি যে, কখন কখন তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত হইতে দেখা যায়, তাহাও কেবল প্রবহমাণ সাংসারিকতা হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন নগর ও গ্রাম হইতে প্রবাহিত দোষ সমুদায় অরণ্যবাসী

মুনিদিগের আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করে, সেই সংসর্গে ঋষিদিগের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। যদি রাজা কিম্বা নগরবাসী ধনী লোকের সঙ্গে ঋষিদিগের কখন সাক্ষাৎ না ঘটিত, যদি ঋষিগণ পতনোন্মুখ রাজন্যকুল রক্ষা করিতে গিয়া স্বভাবের ব্যভিচার দর্শন না করিতেন, তবে কোন দিন তপঃস্বাধ্যায়নিরত মুনিজনের চরিত্রকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারিত না।

আবার দেখ, ঘোরতর ঝটিকাপ্রবাহে সিন্ধু সলিল বিক্ষুব্ধ হইল, তরঙ্গ সকল মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল, দেখিয়া দার্শনিক নাস্তিক্যাভিমানীর কুতর্ক প্রস্রবণ শুকাইল। এত কাল যত গর্ব্ব পোষণ করিয়াছিলেন, যত সম্বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যত সহায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক মুহূর্ত্তে সকল পলায়ন করিল। তখন তিনি প্রাণপণে "দয়াময় রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এক পলকে সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল। নাস্তিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং ঈশ্বরকে খোঁজ করাও আবশ্যক বোধ করেন না। সহসা পুত্র মরিল, অথবা জীবনসর্ব্বস্ব পত্নী মরিল, তখন তিনি সকল তর্ক ভুলিলেন। স্ত্রী পুত্রদিগকে পূর্ব্বে যেমন মৃৎপিণ্ড কিম্বা কাষ্ঠপাষাণবৎ মনে করিতেন, এ সকল জড়ীয় শক্তি বলিয়া লোকের সঙ্গে বিতর্ক করিতেন, এবং "ক্লোরোফরম" ও "হাইড্রোসিয়ানিকম এসিড্' প্রভৃতি বিষয়ে

শক্তি দেখাইয়া আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন, এখন আর তাহা মনে রাখিতে পারিলেন না, হৃদয় ফাটিয়া উঠিল; দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল, অথবা বাষ্পভরে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে শোকের সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেন।

প্রিয় ভ্রাতঃ, এস, এখন আমরা এক বার মৃত্যুশয্যায় শয়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া আসি। দেখ ঐ যে ব্যক্তি মৃত্যুর করাল দংষ্ট্রাঘাতে ছট্ ফট করিতেছেন, ইনি পূর্ব্বে সংসারমদে মত্ত হইয়া অনেক পাপ করিয়াছেন। ইনি বাহিরে সৎকর্ম্মী বলিয়া ভাণ করিতেন, গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিতেন। অর্থলোভে মিথ্যা বলিতেন, এবং চোর দস্যু প্রভৃতিকে কারাবাসের ভয় হইতে বাঁচাইতেন। লোকের নিকট বলিতেন, তিনি কেবল পরের উপকারের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নরহন্তাকে মিথ্যা বলিয়া বাঁচাইতেন, লোকের নিকট পরোপকারব্রতের মহিমা ঘোষণা করিতেন। আবার গোপনে পাপক্ষয়মানসে চান্দ্রায়ণ করিতেন, লোকের কাছে পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা জানাইতেন। আবার মুখে, "মাতৃবৎ পরদারেষু" পাঠ করিতেন, গোপনে অন্যের কুলবধূর কলঙ্কোৎপাদনের চেষ্টা প্রাণ দিয়া করিতেন। এরূপ সহস্র কোটি কোটি পাপ গোপনে করিতেন, লোকে তাহা জানিতে পাইত না।

এখন সংসারের ভোগ ঐশ্বর্য্য, মান মর্য্যাদা, স্ত্রী পুত্র সমুদায় ছাড়িয়া যাইতেছেন। এখন বুঝিয়া ছেন, যাহার জন্য এত পাপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হইল না। যাহাদিগের তৃপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিযাছেন, তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। যে জন্য সহস্র সহস্র পাপানুষ্ঠান করিযাছেন, সে প্রযোজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিযগণ অবসন্ন, পরিবার বন্ধু বান্ধব, মান সম্ভ্রমের আর প্রয়োজন নাই, সকল প্রযোজন শেষ হইযাছে। সুতরাং পূর্ব্বকৃত পাপতরঙ্গে মন পুনঃ পুনঃ আহত হইতেছে, এবং তজ্জন্য তিনি শোক ও অনুতাপ অকপট ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন আপন দুষ্কর্ম্মে অন্ধ হইয়া পূর্ব্বে যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকটে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর ভাবে ক্ষমা চাহিতেছেন। আর উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই বিশ্বরাজের প্রতি কাতর ভাবে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এত কাল যাহা যত্নপূর্ব্বক গুপ্ত রাখিয়াছিলেন; সহস্র ব্যক্তির অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও সে সকল গুপ্ত পাপ ঘুণাক্ষরের ন্যায় অনুভব করিতে পারেন নাই; আজ সে দিন, সে সংসারের অনুকূল দিন ফুরাইয়াছে; আজ শত্রু মিত্র সমান হইয়াছে, আজ যাহারা শত্রু ছিল, তাহাদের নিকটই সকল পাপ ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, আর গুপ্ত রাখিতে পারিলেন না। আর

সংসারের কুটিল স্বার্থপর অনুরোধ কার্য্যকর হইল না। অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া সেই পাপভাণ্ডার পুড়িয়া ছারখার করিল। যেমন স্বাভাবিক পবিত্র ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন, সেইরূপ পবিত্র ভাব লইয়া পিতার নিকট যাইতে পারিলেন না বলিয়া এত অনুতাপ। প্রিয় ভ্রাতঃ, বুঝিলে স্বভাব কেমন সুন্দর? দেখিলে, আত্মা কেমন পবিত্র? বস্তুতঃ আত্মাতে পাপ নাই, বিশুদ্ধ জ্ঞান যখন অন্ধ হয়, প্রেম তখন কাজে কাজেই অপাত্রে স্থাপিত হয়, ইচ্ছা দুর্ব্বল হয়, দুরভিলাষ অতি সহজে আত্মাকে লইয়া পাপ পথে প্রস্থান করে। আবার যখন সমুদায় আকর্ষণ, সমুদায় বন্ধন ও সমুদায় কৃত্রিমতা চলিয়া যায়, অনুতাপানল সমুদায় পাপাবরণ দগ্ধ করিয়া ফেলে, আত্মা তখন স্বতঃ নির্ম্মল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আত্মা পরিমিত, আত্মা সসীম। জ্ঞানের এই সীমা যখন উল্লঙ্ঘিত হয়, তখনই আত্মা অপবিত্র হয়, নতুবা আত্মা আপন সীমাতে চিরকাল পবিত্র।

আত্মা অমর।—আত্মার বিনাশ নাই। কোন পার্থিব উপাদানে উহা নির্ম্মিত হয় নাই। যে উপাদানে উহা নির্ম্মিত, তাহার সঙ্গে বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং কোন প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা উহার অনিষ্ট অসম্ভব। উহা অগ্নিতে পোড়ে না, জলে পচে না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, অস্ত্রাদি দ্বারাও ছিন্ন হয় না। বস্তুতঃ ভৌতিক প্রকৃ-

ভিন্ন এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন ভৌতিক কারণ জগতে নাই, যাহাতে উহার বিনাশ হইতে পারে। এ জন্য ইহলোকস্থ পদার্থনিচয়ের শক্তি আত্মাতে সংক্রামিত হইতে পারে না।

শরীর ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত, সুতরাং পার্থিব বস্তুর শক্তিতে শরীরে উপচয় ও অপচয় হইতে পারে, এবং সর্ব্বদাই পার্থিব পরমাণুপুঞ্জের অনিষ্টকর শক্তিতে শরীর বিনষ্ট হইতে দেখা যায়; কিন্তু আত্মার সঙ্গে পার্থিব বস্তুর সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। যদিও পার্থিব শরীরের সহিত আত্মার এমন একটা গূঢ় সম্বন্ধ ও যোগ দৃষ্ট হয় যে সে যৌগিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে উহাকে অনুভব করা কষ্টকর হইয়া উঠে, তথাপি শরীর বিনষ্ট হইলেও উহার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যসম্ভূত পরিবর্ত্তন সকল ক্রমে ক্রমে শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ যে চর্ম্ম কোমল, মসৃণ ও চিক্কণ ছিল, তাহা ক্রমে দৃঢ় বন্ধুর হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে শুষ্ক লোলিত হইয়া পড়িল, জানিতে পাইলাম না। সূক্ষ্ম পাণ্ডুর রোম সকল দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ হইল, পরিশেষে একে বারে বিশুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু কিরূপে হইল, জানিলাম না। শরীরের রক্ত মাংস মেদ, বসা, শিরা ও ধমনী সকল প্রথমতঃ কোমল ও অনায়ত ছিল, ক্রমে দৃঢ় ও আয়ত হইল। এখন

আবার ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। আগে দন্ত সকল সূক্ষ্ম ও মৃদু ছিল, তৎপর দৃঢ় ও স্থূল হইল, এখন ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িল। এই সকল পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল আমরা তাহার এক বিন্দুও জানিতে পাইলাম না। কেন পাইলাম না? এ সকল বাহ্য পরিবর্ত্তন শরীরের, আত্মার নহে। সুতরাং শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আত্মা তাহা জানিতেছে না। জড়ীয় প্রকৃতির অতীত আত্মা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ফলতঃ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য আত্মার নাই। আত্মা যত পরিণত হইতে থাকে, যত অধিক দিন অতিক্রম করে, ততই জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া উঠে, অবনত হয় না। যেমন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য শরীরের অবস্থা, আত্মার নহে, সেই রূপ মৃত্যুও শরীরের বিনাশ আত্মার নহে।

আত্মা অনেক। যত শরীর তত আত্মা। কেহ কেহ বলেন, "আত্মা একটী মাত্র, তাহাই প্রতি শরীরে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হইতেছে। যেমন বহু দর্পণ সূর্য্য কিরণে রাখিলে প্রত্যেক দর্পণে এক একটী সূর্য্য আছে বলিয়া বোধ হয়, সেই রূপ একই আত্মা সমস্ত মানব দেহে জ্যোতি বিস্তার করিয়া আছে।" এ মতটীও ভ্রমাত্মক। একটী আত্মা কখন বহু দেহে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণ যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র কার্য্য করে না; মানবদেহে আত্মার যদি সেই রূপ প্রতিবিম্ব-

দেহের অধিষ্ঠাতা হয়, তাহা হইলে একের বাল্য, একের যৌবন, অপরের বার্দ্ধক্য, অপরের মৃত্যু কখন সম্ভবপর হইতে পারে না।

আত্মা স্বাধীন। আত্মা আপনি আপনার অধীন। আত্মা কখনও পরের অধীনতা স্বীকার করে না ও করিতে পারে না। জড়বাজ্যের তত্ত্বসকল দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে জড় নিতান্ত পরাধীন। পর কে? সজ্ঞান ও সচেতন আত্মা। আত্মা আর জড় এই দুই প্রকার বস্তু লইয়া জগৎ। জড় ও আত্মা ভিন্ন জগতে আর যখন বস্তু নাই, তখন জড় আত্মার পর, আত্মা জড়ের পর, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জড় আত্মার অধীন, আত্মা স্বাধীন। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, এই তিনটী আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সূর্য্য যেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়, জ্ঞান সেই রূপ সমস্ত মোহজাল ছিন্ন করিয়া স্ফুরিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের নিকটে যে, কোন রূপ অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না ইহা নিশ্চিত। ভাব জ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা গ্রহণ করে; আত্মা সেই সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে ইচ্ছা এত তীব্রভাবে আত্মাকে উত্তেজিত করে যে উহার সেই তীব্রতা অনিবার্য্য। যেমন জল তেজের বিরোধী হইলেও মেঘে বিদ্যুদগ্নি নিবারিত থাকে না, সেই রূপ ইচ্ছা বিস্ফুরিত হইলে, যত প্রতিবন্ধ থাকুক আত্মার

কার্য্য অপ্রকাশ থাকে না। জ্ঞান বিবেক বলে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়, ইচ্ছা সত্বরা হইয়া তাহা সম্পন্ন করে। ইচ্ছার এই সত্বরতাব নিকট কোন প্রতিবন্ধক এক মূহুর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। এই জন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ জড়কে বিষয় এবং আত্মাকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার বিষয়, সেই বিষয়ী। সুতরাং অতি সহজে বুঝা যাইতেছে যে, বিষয় আত্মার অধীন, কাজে কাজেই আত্মা স্বাধীন। আত্মার এই স্বাধীনতা বিষযের নিকটেই সঙ্গত। কিন্তু ঈশ্বর যিনি সমুদায় জগতের এক মাত্র স্রষ্টা, যাহাতে আত্মা ও জড় আশ্রিত ভাবে রহিযাছে, তাঁহার নিকটে অসঙ্গত। আত্মাব তাদৃশ বল ও সৌন্দর্য্য যিনি প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি আত্মার পর হইতে পারেন? কখনই না। প্রত্যুত তিনি আত্মার আপনার অপেক্ষাও আপনার। সুতবাং যিনি ধন, মান, জ্ঞান, বল ও বুদ্ধি সমুদাযের মূল কারণ, তাঁহাব অধীনতা পরাধীনতা নহে। বরং যিনি আপনার, তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেই প্রকৃত পরাধীনতা প্রকাশ পায়। অতএব ঈশ্বরের একান্ত অনুগত থাকিয়া বিষয়াকর্ষণের প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। এই কথাটী অন্যভাবে অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। যে কার্য্য বিষয়াসক্তির প্রতিকূল, ঈশ্বরের আনুগত্যে তাহা সাধিত হইবে; আর ঈশ্বরের প্রতিকূলে যাহা সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা বিষয়াসক্তির অনুকূল না

হইয়া যায় না। সুতরাং ইহা অতি সহজে বুঝা যাই-তেছে যে, আমরা যতই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারিব ততই স্বাধীন হইব; এবং যতই বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব ততই পরাধীন হইব। এই স্বাধীনতার অধিকার কেবল মনুষ্যের আছে, অন্য কাহারও নাই। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক পরম মঙ্গলা-ধার ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে, আর কেহ পারে না; সুতরাং আত্মা স্বাধীন।

আত্মা শরীরী। আত্মা অপূর্ণ, এজন্য অনেক হওয়া আবশ্যক। অনেক আত্মা সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিলে অপূর্ণতা নিরসন এবং দুঃখ দূর হইতে পারিবে; এজন্য সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বর আত্মার অনেকত্ব সম্পাদন করিয়া যেমন অপূর্ণতানিবন্ধন দুঃখ দূর করিবার উপায় করিয়াছেন, সেই রূপ আবার শরীর প্রদান করিয়া আত্মাসকলের পরস্পর ঘনিষ্ঠতালাভের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন। শরীর আছে বলিয়াই পিতা মাতা পুত্র কন্যা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের প্রয়োজন। শরীর আছে বলিয়াই ভ্রাতা ভগ্নী ও তৎসম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্য আছে। শরীরের জন্যই পিতামহ, মাতামহ, মাতুল ও পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা প্রভৃতি পরীবার ও তৎসম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্য অবশ্য-ম্ভাবী হইয়াছে। শরীরের জন্যই রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি আছে; এবং সেই জন্যই তাদৃশ পতনো-

সুখ দুঃখরাশির প্রতিকার চিন্তা আছে। শরীরের জন্যই মান, মর্য্যাদা, সুখ, সম্পদ, আহ্লাদ ও আমোদ আছে। শরীরের জন্যই বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা আছে। এই সকল অবস্থার জন্যই উন্নতি অবনতি আছে; গুরু শিষ্য সম্বন্ধ আছে, এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তব্য আছে। শরীরের জন্য শারীরবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। শরীরের জন্যই শিল্প, সাহিত্য ও গণিত প্রভৃতির প্রয়োজন। শরীরের জন্যই অন্ন বস্ত্র, শরীরের জন্যই সুপথ্য কুপথ্যের বিচার, শরীরের জন্যই ঘর দ্বার সমুদায়ের প্রয়োজন। ফলতঃ শরীর ব্যতীত জগতের সমুদায় প্রয়োজন উঠিয়া যায়। শরীর আছে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সকল আছে। আবার সেই সকল কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন আছে বলিয়াই পরস্পর আত্মা সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাকর্ষণ আছে, এবং সেই ঘনিষ্ঠতা ও যোগাকর্ষণের বলেই আত্মার প্রীতি সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে। সেই প্রীতি সদ্ভাবাদির বলেই আবার পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ প্রভৃতি অপূর্ণ আত্মার অবস্থা সমুদায়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব শরীর চাই, শরীর না থাকিলে আশা ভরসা, উন্নতি বিনতি, ভক্তি কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং জগৎ ভাব শূন্য ও নীরস হইয়া উঠে। তাদৃশ জগৎ সৃজনে ঈশ্বরের রুচি নাই। সুতরাং তিনি শরীর-

বিহীন আত্মার সৃষ্টি করেন নাই। যে অবস্থায় আত্মা স্থাপিত হইয়াছে, এ অবস্থায় শরীর না থাকিলেই চলে না। করুণাময় পরমেশ্বর জাগতিক কার্য্যকলাপের যেরূপ ব্যবস্থা করিযাছেন, সেরূপ না করিয়া অন্যরূপ করিলে কি হইত, তাহা চিন্তা করিবার আমাদেব অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার এক বিন্দুও অন্যথা করিলে আমাদিগেব রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি আসিতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় সেই ব্যবস্থার বাহিবে এক পদও অগ্রসর হইবার আমাদিগের ক্ষমতা নাই, ইহাই আমাদিগের চিন্তনীয়।

জগতের আত্মাব অবস্থান জন্য ঈশ্বর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার পক্ষে যে সকল কত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সমস্ত নির্ব্বাহ করিবার জন্য যেমন শরীর থাকা আবশ্যক, তেমনি শরীরের আবার ইন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ানুরূপ আবার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বোধ থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই। যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার পক্ষে তাহা আছে, কাহারও এক বিন্দু অভাব নাই। ইন্দ্রিয-পরিরঞ্জিত এই শরীর লইয়া আত্মা শরীরী বলিয়া অভিহিত হন। শরীর আত্মার রথ, মন সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, আত্মা এই শরীররথে চড়িয়া জগতে ভ্রমণ করেন; অথবা শরীর আত্মার কার্য্যসাধক যন্ত্র, শরীর যন্ত্র দ্বারা আত্মা জগতের কার্য্য করেন।

শরীরযন্ত্রের সাহায্যে আত্মার যে সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল কার্য্য সাধনোপযোগী মনোবৃত্তি থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না মনই ভাব রাজ্যের রাজা; ইন্দ্রিয় সকল তাহার আবির্ভাবের স্থান মাত্র। পূর্ব্বে যে সকল সম্বন্ধ ও সম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল কর্ত্তব্য শরীর দ্বারা সংসাধন করিতে হয়। কিন্তু শরীর কার্য্য করিতে পারে না, শরীর অবশ। সুতরাং শরীর কার্য্যের সাধন হইলেও তাহার পরিচালনী বৃত্তি চাই। সেই জন্য ভক্তি, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়পরতা, বীতরাগিতা, আশা, অধ্যবসায়, সরলতা, উদারতা, প্রীতি ও বৎসলতা, লজ্জা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃত্তি সকল আছে বলিয়া এই সকল বৃত্তিনিষ্ঠ বিষয়ও আছে। পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু, রাজা, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ, সখা, ভ্রাতা, ভগিনী, দরিদ্র, রুগ্ন, প্রজা, শিষ্য ও ভৃত্য প্রভৃতি ঐ সমস্ত বৃত্তির বিষয়। শরীর আছে বলিয়া এই সমস্ত শরীরনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সম্বন্ধ আছে বলিয়া তৎপালনোপযোগিনী বৃত্তি আছে; বৃত্তি আছে বলিয়া তাহার উপযোগী বিষয় আছে। পতি পত্নী আছে বলিয়া তদনুরূপ ভাব আছে। পুত্র কন্যা আছে বলিয়া বৎসলতা প্রভৃতি আছে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন আছে বলিয়া ভক্তি বিনয় কৃতজ্ঞতা আছে। দুঃখী দরিদ্র শোকাতুর আছে বলিয়া দয়া দাক্ষিণ্য আছে। কষ্ট

যন্ত্রণা আছে বলিয়া ধীরতা সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় আছে। ইষ্ট জন বিযোগ আছে বলিয়া শোক মোহ এবং তৎসহনে ক্ষমতা আছে। পাপপূর্ণ এই জগতে ঘৃণাস্পদ লজ্জাকর বিষয় আছে বলিয়া ঘৃণা ও লজ্জা আছে এবং তাহা হইতে বিমুক্তি লাভের জন্য অনুতাপ করিবার সামর্থ্য আছে। ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া সমুদায় দুঃখ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত সুখ শান্তিতে চিরপরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইবার আশা ও ভরসা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

একাত্মবাদ নিরাশন।

যে সকল দার্শনিকেরা নিজ নিজ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন না কোন সম্প্রদায় এই একাত্ম-বাদ ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়া উহার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থানেই এই ভ্রান্তির অধিবাস আছে, কিন্তু কোথাও আভাষ, কোথাও অতি অল্প। পণ্ডিতবর শঙ্করাচার্য্য হইতে এ দেশে উহা একরূপ বদ্ধ মূল হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, একাত্মবাদিগণের চেষ্টায় আমাদিগের ভূরিশ অনিষ্ট হইয়াছে। কেননা উহা নাস্তি-কতার সুদৃঢ় মূল। এই মূল মানবহৃদয়ে বদ্ধ হইলে ক্রমে তাহা হইতে ঘোরতর নাস্তিকতা উৎপন্ন হয়। মনুষ্য ঈশ্বর হইয়া যায়, সুতরাং ইহকাল, পরকাল, উপাসনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি কিছুই থাকে না; ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতিও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অন্যতঃ, কেহ কেহ বলেন, এই মত প্রচার হওয়াতে ভারতবাসি-

গণের কুসংস্কার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং ইহা দ্বারা যে বহু উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। যখন এ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত চলিতেছে, তখন ঐ দুই মত কত দূর বিশুদ্ধ একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

একাত্মবাদিগণ যে সকল কথা লইয়া বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলির উল্লেখ করিবার সময় ও স্থান নাই এবং প্রয়োজনও বোধ হয় না। এ জন্য স্থূল কথাগুলির আলোচনা ও অবতারণা করা যাইতেছে।

১। ইঁহারা বলেন, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু, অজ্ঞান মায়া প্রভৃতি সমস্ত জড় অবস্তু *।

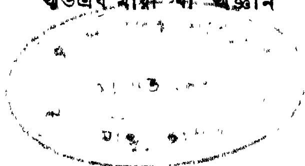
২য়। তাঁহারা এই অবস্তুর দুইটী ভাব কল্পনা করেন, এক সমষ্টি, দ্বিতীয় ব্যষ্টি। সমষ্টিতে বল অধিক, ব্যষ্টিতে বল অল্প। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবাপন্ন অবস্তুসম্মিলিত বস্তু সাধারণতঃ তাঁহারা চৈতন্য শব্দে উল্লেখ করেন।

* ইঁহারা অজ্ঞানকে ঐশী শক্তি বলেন। শক্ত বস্তুতে শক্তি বা গুণ আধেয় ভাবে অবস্থান করে, এইজন্য অজ্ঞান ইঁহাদের মতে অবস্তু। বস্তুর যাহা শক্তি বা গুণ, তাহা অবস্তু হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মরূপ বস্তুর গুণের নাম অজ্ঞান হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ, বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাহারাই যদি সেই ব্রহ্মের গুণকে অজ্ঞান বলেন তবে ব্রহ্মের চিদাভাসত্ব রহিল কৈ ?

৩য়। মায়াসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে বলাধিক্য প্রযুক্ত তাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলিয়া নিশ্চয় করেন। এই বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান চৈতন্য লূতাতন্তুর ন্যায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে বর্ত্তমান আছেন। কেন না সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য ইহাঁরই উপরে নির্ভর করে। ইনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে খ্যাত। মলিনসত্ত্ব-প্রধান চৈতন্যে বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস প্রভৃতি নাম আরোপিত হইয়াছে।

৪র্থ। অধ্যারোপ অপবাদ ন্যায় দ্বারা এই অবস্তুপহিত বস্তুকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার এবং অবস্তুসম্ভূত ভ্রান্তি দূর করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আর "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্ম" প্রভৃতি ভ্রান্তিপোষক বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করা হইয়াছে। এইত গেল একাত্ম-বাদিগণের সামান্য মত, এ বিষয়ে আমাদিগের কি মত তাহা এখন ক্রমে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

১ম। বস্তু কি? সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। কেন? ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্মই অবিনাশী, ব্রহ্মই সমস্ত জ্ঞানের ও সমস্ত আনন্দের আধার এই জন্য। অবস্তু কি? মায়া বা অজ্ঞান। কেন? তাহা নাই, তাহা মিথ্যা, তাহাতে জ্ঞান ও আনন্দের কণামাত্রও নাই এই জন্য। যাহা আছে, তাহা অবশ্যই বস্তু, যাহা নাই তাহা অবশ্যই অবস্তু হইবে। অতএব মায়া বা অজ্ঞান



যে কিছুই নয়, একাত্মবাদিগণের কথাই তাহার অকাট্য প্রমাণ *।

২য়। যাহা নাই, যাহা মিথ্যা, তাহার সমষ্টি হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার সমষ্টি এ কথা শুনিলে হাসি ও দুঃখ দুইই উপস্থিত হয়। বামে অঙ্ক স্থান শূন্য রাখিয়া কেবল শূন্য দ্বারা যিনি রাশির গণনা করেন তিনি কি উন্মাদ নহেন? সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে মিথ্যাকে কৌশল ক্রমে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া আবার তাহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিবার উপদেশ দেওয়াতে লোকের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিবার জন্য এক রূপ চাতুর্য্যজাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। আবার যাহা সত্য যাহা নিত্য যাহা বস্তু, তাহার সঙ্গে মিথ্যা বা অবস্তুর সম্মিলন হয় না হইতেও পারে না। বস্তুতঃ যাহা নাই কিছু নয়, তাহার সহিত সম্মিলন হইবে কি রূপে? সুতরাং ঊর্ণনাভ যেমন স্বকৃত জালের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়-

---

* বেদান্তমতে এই অজ্ঞান সৎ এবং অসৎ উভয় দ্বারা অনির্ব্বচনীয়। পঞ্চদশীতেও ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা সৎ তাহা সৎই, যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না। অজ্ঞান ব্রহ্মের শক্তি, সুতরাং অজ্ঞান সৎ। আবার অজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ আছে এই জন্য তাহা অসৎ। এরূপ হইতে পারে না; কেন না যাহা ব্রহ্মের শক্তি তাহা চিরকালই সৎ থাকিবে, অসৎ কখন হইবে না। যাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

মিত্ত কারণ, মায়ী ঈশ্বরও তেমনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে না। ঊর্ণনাভের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহাই তাহার স্বকৃত জালের নিমিত্ত, আর ঊর্ণনাভের শরীর সেই জালের উপাদান। তবে কি ব্রহ্মের শরীর আছে? অজ্ঞান বা মায়া কি ঈশ্বরের শরীর? যদি মায়া ঈশ্বরের শরীর হয় তবে সে মায়া অবস্তু হইবে কিরূপে? সুতরাং মায়া মিথ্যা বা অবস্তু হইতে পারে না এবং ঈশ্বরে জগৎ ভ্রান্তি বলিয়া একাত্মবাদিগণ যে আড়ম্বর করিয়াছেন তাহাও হইতে পারিল না। কেন না তাঁহাদিগের কথা দ্বারা মায়া ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অবস্তু বলিয়া প্রমাণ হয় না। আর যদি মায়াকে অবস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে বস্তু অবস্তুতে সম্মিলন হইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরে জগৎ ভ্রান্তি হইতে পারিল না।

৩য়। যখন বস্তুতে অবস্তুর উপস্থিতি হইতে পারে না *, যখন মায়া কিছুই নয়, তখন তাহাতে উপাদান হইবার বস্তু কোথায়? যখন উপাদান হইবার কিছুই নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রাধান্য এবং মলিনসত্ত্বপ্রাধান্য

---

* মায়া ব্রহ্মের শক্তি কিংবা গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মেতে মায়া থাকিতে পারে। সে গুণ বা সে শক্তি কখন সুখ দুঃখ ও ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুগত হইতে পারে না। যে বস্তুর যে শক্তি তাহা সেই বস্তুর উপযুক্ত হইবে অনুপযুক্ত হইতে পারে না। অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নির অনুরূপ। উহা তৃণ কাষ্ঠ ভস্ম করে, অগ্নিকে ভস্ম করিতে পারে না।

কিরূপে সংগত হইতে পারে, এবং তন্নিষ্ঠ ব্রহ্ম ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, বিশ্ব, বৈশ্বানর প্রভৃতি কল্পনাই বা কিরূপে হইতে পারে?

৪র্থ। অধ্যারোপ ন্যায় কি? অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। যেমন রজ্জু সর্প নহে, অথচ রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, ইহাকে অধ্যারোপ বলা যায়। এইরূপ অধ্যারোপ ন্যায়ও এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না রজ্জুতে যে সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে তাহা কাহার? যাহার সর্প বিষয়ক জ্ঞান আছে। এক দিন যে সর্প আপন চক্ষুতে কোথাও দেখিয়াছে, যে সর্পের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, রজ্জু দেখিলে তাহারই সর্প বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু যে কখন সর্প কিরূপ জানে না, সর্পের অস্তিত্ব মাত্রেও বিশ্বাস করে না, তাহার তদ্বিষয়ক ভ্রম জন্মিতে পারে না। অতএব যে মায়া অবস্তু, যাহার বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? যদি মায়াবিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে না আসিতে পারে, তবে ভ্রমও আসিতে পারে না *।

৫ম। এতদপেক্ষা আরও এক চমৎকার রহস্য আছে।

---

* পঞ্চদশী প্রণেতার মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি, সুতরাং অভিন্না এবং অনাদিসিদ্ধা। এরূপ হইলে তজ্জন্য ভ্রান্তি হইতে পারে না। কেন না শক্তির প্রতি শক্তের কর্তৃত্ব, শক্তের প্রতি শক্তির কর্তৃত্ব নাই। আমার শক্তি দ্বারা আমি কার্য্য করিতে পারি, ভ্রান্ত হইতে পারি না।

"আমি ব্রহ্ম" এবং "তুমিও ব্রহ্ম" এই কথা লইয়া একাত্মবাদী নাস্তিকগণ মারামারি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দোষানুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। আমি ব্রহ্ম অথচ আমি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছি, তুমি ব্রহ্ম অথচ তুমি শুক্তিতে রজত দেখিতেছ কেন? আমিও ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম, তবে ভ্রান্তি কাহার? ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ সুতরাং ব্রহ্মের ভ্রান্তি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। "অহং ব্রহ্মের ভ্রান্তি' বলিলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই ভ্রান্তি বলা হইতেছে। সুতরাং "ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ" এ সকল সত্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা যদি বিনাশ পাইল, তবে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপরে সাজ্ঘাতিক খড়্গাঘাত করা হইল। ব্রহ্মের এত দুর্গতি, এত অবমাননা কেন? ব্রহ্ম এত বিড়ম্বিত হইলেন কেন? এ কি একাত্মবাদিগণের মহিমা? অথবা তাঁহাদের কল্পিত মায়ার প্রভাব *?

* মায়া যদি স্বতন্ত্রা হন, তবেই তদ্দর্শনে ব্রহ্মের ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু একাত্মবাদিগণ তাহা বলেন না। তাহা বলিলে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাপি মায়ার অসীম প্রভাব কল্পনা করিয়াছেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্য নহে। আবার মায়া যদি শক্তি, তবে তাহাতে ভ্রান্তি হইবে কিরূপে? কেন না শক্তিতে ভ্রান্তি নাই, ক্রুটিতেই ভ্রান্তি। পরব্রহ্মে একবিন্দুও ক্রুটি নাই, এই জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। অনন্তশক্তি অনন্ত জ্ঞান ব্রহ্ম ভ্রান্ত, ইহা অপেক্ষা দুঃখের সংবাদ আর কি আছে?

ইহাঁরা যে মায়াকে প্রথমতঃ অবস্তু বলিয়াছেন, পরে আবার সেই মায়াকে এত দূর প্রবল প্রতাপ অর্পণ করিয়াছেন যে ব্রহ্মের উপরেও তাহার আধিপত্য! যে মায়া অবস্তু, সে মায়ার এত প্রভাব হইল কিরূপে? হায়! অবস্তুর এত ক্ষমতা হইল যে সে বস্তুর উপরে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপরে আধিপত্য করিল? কি চমৎকার! কি অসঙ্গত ভ্রান্তি! অনেকে এই মতকে আবার অতি উচ্চ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, যদি তাঁহারা বা অন্য কেহ এই মারাত্মক মতে যোগ দিতে যান, তবে অগ্রে ইহার গূঢ় অবস্থা ঘটিত সত্যাসত্য বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, পরে গ্রহণ করিবেন। সহসা অন্য কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে সত্যের প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িবেন।

যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা সুন্দর বুঝা যাইতেছে যে একাত্মবাদ মিথ্যা, অলীক এবং অপ্রামাণ্য, সুতরাং অগ্রাহ্য। যদি একাত্মবাদ অগ্রাহ্য, তবে গ্রাহ্য কি? অবলম্বনীয় কি? কোন্ মত আশ্রয় করিলে আমাদিগের মঙ্গল? ইহার এক মাত্র উত্তর এই, যাহা বিশ্বাসসিদ্ধ, তাহাই অবলম্বনীয়। বিশ্বাস্য এবং বিশ্বাস রাখিবার স্থানই বা কোথায়? একাত্ম-বাদিগণ ব্রহ্মের যে লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা কেবল মাত্র সেইটী ধরিয়া আলোচনা করিলে বিশ্বাস রাখিবার

অনেক স্থান পাইতে পারিব, কিন্তু তদ্ব্যতীতও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসকল অনুসন্ধান করিলে আরও সুন্দর বিশ্বাসের ভূমি পাইতে পারা যায়।

একাত্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। সৎস্বরূপ কি? যিনি সকল দেশে ও সকল কালে সমানরূপে বিদ্যমান। চিৎ স্বরূপ কি? যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল তত্ত্ব জানেন। কোন বিষয়ে যাঁহার এক বিন্দুও অজ্ঞতা নাই। আনন্দ কি? যাহাতে দুঃখ, শোক, ভয়, বিষাদ প্রভৃতি নাই। অদ্বিতীয় কি? না—যাঁহার আর দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ যাঁহার অনুরূপ কোথাও নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রুতিকারগণ ইহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, মঙ্গলময়, শুদ্ধ, অপ্রতিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। যিনি দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, সূক্ষ্ম, গুপ্ত ও প্রকট, বেদ্য ও অবেদ্য সকল জানিতেছেন, যাঁহাতে দুঃখ, শোক, ভয়, বিষাদ প্রভৃতি স্থান পাইতে পারে না, তিনি অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান্। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার এক বিন্দুও ত্রুটি থাকিতে পারে না। ত্রুটি থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে না। যাঁহার ত্রুটি মাত্রও নাই, যাঁহার অজ্ঞাত বিষয় মাত্রও নাই, যাঁহাতে দুঃখ শোকাদি আসিতে পারে না,

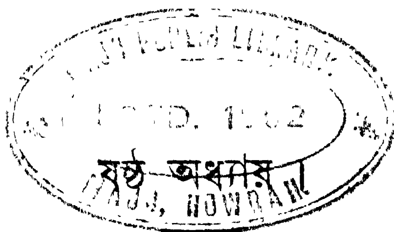
* "সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণম্-প্রতিমমিতি।"

তাঁহার মত যে আর নাই, ইহা বুঝিবার আর সংশয় রহিল না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন। কার্য্য না করিলেও চলে না দেখিয়া কার্য্যকর্ত্রী এক মায়া কল্পনা করিয়া আবার সেই অদ্বৈতত্ব নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিয়া যে কি লাভ হইল, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। বস্তুতঃ অদ্বিতীয় কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অনুরূপ আর নাই সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এক গুচ্ছ তৃণের সঙ্গে ব্রহ্মের দ্বৈতত্ব কল্পিত হইতে পারে না। এই বিশ্ব তাঁহার নিকটে এক গুচ্ছ তৃণসদৃশ, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের আনুরূপ্য কি প্রকারে হইবে?

যাউক, যখন ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন বস্তুতঃ এক গুচ্ছ তৃণও ছিল না। যখন তৃণটী মাত্রও ছিল না, তখন তিনি আপন ঐশী শক্তিপ্রভাবে এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন *। কুম্ভকার যে ঘট প্রস্তুত করে, স্বর্ণকার যে কুণ্ডল প্রস্তুত করে, তাহার নাম নির্ম্মাণ, সৃষ্টি নহে। কেন না মৃত্তিকা ছিল, অন্যান্য উপকরণ ছিল, সেই সকল বস্তুর সাহায্য লইয়া মনুষ্য নিজের বুদ্ধিপ্রভাবে ঘটকুণ্ডলাদি প্রস্তুত করিতে পারে, সুতরাং এরূপ কার্য্যের সঙ্গে ঐশী শক্তির তুলনা হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের যে

*। "ব্রহ্মৈবৈকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদেব সর্ব্বমসৃজৎ।"

সৃষ্টি, তাহাতে করণ উপকরণ কিছুই চাই না। করণ বা উপকরণ চাহিলেই ত্রুটি আসিবে, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তা আর থাকিবে না। একাত্মবাদিগণ নিজের ত্রুটী চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন উপকরণ না পাইলে কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে উপাদান ব্যতীত যখন কোন বস্তু হইতে পারে না, তখন ঈশ্বরের জগৎ কার্য্যেও উপাদান চাই। এইরূপে নিজের অসামর্থ্য ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপ করিয়া মায়া ব্যতীত কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম কোন কার্য্য করিতে পারেন না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা এরূপ বলি না। আমরা বলি, ঈশ্বরের জগৎ কর্ত্তৃত্বে উপাদান চাই না, উপকরণ করণ কিছুই চাই না, কেবল তাঁর শক্তি চাই। কেন না এ সকল চাহিলেই ত্রুটি আইসে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, অদ্বৈতত্ত্ব, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপে কলঙ্ক আইসে। অতএব ঈশ্বর আপন ঐশী শক্তিপ্রভাবে সমুদায় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপন শক্তিপ্রভাবে জানেন, ও রক্ষা করেন। মনুষ্য পশু প্রভৃতি সচল ও অচল সমুদায় তাঁহার আশ্রিত, তিনি সকলের আশ্রয়। তাঁহার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, এবং অপ্রতিমভাব দেখিয়া মনুষ্য তাঁহার উপাসনা করিবে, ইহাই যথার্থ, ইহাই সত্য, ইহাই বিশ্বাস্য।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বর।

জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার একটীরও পূর্ব্বে নাম ছিল না। তাহাদের স্বভাব ও শক্তি অনুসারে পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রত্যেক বস্তুর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যখন মনুষ্যগণ বস্তু সকল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের স্বভাব ও শক্তির আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই সকল বস্তু যখন কার্য্যে প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইল, তখন তাহাদিগের নামও হইল।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই রূপ। যখন জগৎ ছিল না, যখন জগতে জ্ঞানবান্ মনুষ্য ছিল না, তখন ঈশ্বরকে কে অনুভব করিবে? সুতরাং তৎকালে তাঁহার নামও ছিল না। বস্তুতঃ ঈশ্বর নিরুপাধি। দেশভেদে, ভাষাভেদে, মনুষ্যহৃদয়ের ভাব ও উন্নতিভেদে লোকেরা তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া ডাকে। তাঁহার স্বভাবের আলোচনা করিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে তাঁহার শাস্তৃত্ব আছে, কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না, তখন তাঁহাকে শাস্তা বলিয়া সম্বোধন করে। যখন তাঁহাতে পালকের স্বভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়, তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকে। যখন

তাঁহাতে বিচারকের ভাব দেখিতে পায়, তখন তাঁহাকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করে। যখন মনুষ্য তাঁহার ঐশী শক্তির পরিমাণ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে, তখন তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান, ও যখন দেখিতে পায় তাঁহাতে দুঃখ শোক ভয় বিষাদ কিছু মাত্র নাই, তখন তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া আনন্দে গলিয়া যায়। যখন দেখিতে পায় তাঁহার সত্তা সকল কালে ও সকল দেশে বিদ্যমান, তখন তাঁহাকে সত্যস্বরূপ না বলিয়া থাকিতে পারে না। যখন তাঁহার স্নেহ ও মমতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পায়, তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাকে জননী বলিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যখন তাঁহার জ্ঞান শক্তির আলোচনা করিয়া তাঁহার নৈপুণ্য ও অসীম জ্ঞাতৃত্ব অনুভব করিতে পারে, তখন তাঁহাকে স্রষ্টা নিয়ন্তা ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া সম্বোধন করে। যখন মনুষ্য ভাবিয়া দেখিল ঈশ্বর ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত বাঁচিবার যো নাই, একটী নিশ্বাস প্রশ্বাসও তাঁহার করুণা ভিন্ন প্রবাহিত হইতে পারে না, তখন তাঁহার নাম জীবনের জীবন আত্মার আত্মা রাখিল। এইরূপ চিন্তা ও উপলব্ধি দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বর হইতে যখন যে ভাব দোহন করিতে পারে, তখন সেই ভাবের অনুরূপ একটী নাম দিয়া তাঁহাকে ডাকে। বস্তুতঃ তাঁহার কোন নাম নাই, যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোন নাম থাকিত, তবে সকল দেশীয় নরনারী তাঁহাকে একটী মাত্র নাম ধরিয়া

ডাকিত। যখন মনুষ্য বুঝিল যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিলে জীবন শূন্যভাব ধারণ করে, তখনই তাঁহার নামের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তখন হইতে ক্রমে তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচায়ক অনন্ত নাম জগতে ব্যাপ্ত হইল।

ঈশ্বরের কোন ভৌতিক আকার নাই, ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরকে নিরাকার বলিলে ইহা বুঝায় না যে তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার যাহা আছে, তাহাই সমস্ত জগতের মূল কারণ, কিন্তু উহা ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়ীভূত। ভৌতিক বস্তু বা সৃষ্ট বস্তুর প্রতিই ইন্দ্রিয়গণের অধিকার। সৃষ্টির অতীত বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব চলে না *। ঈশ্বর সকলের স্রষ্টা, তিনি সৃষ্ট নহেন; সুতরাং তিনি সৃষ্টির অতীত। সৃষ্টির অতীত ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই; এই জন্য তাঁহার নিকটে ইন্দ্রিয়দিগেরও কোন ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রিয় আমাদিগের জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়। যে স্থানে ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই, সে স্থানে আমাদিগের জ্ঞানও অচল। তবে কি আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে অনধিকারী? চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে আমরা তাঁহাকে না অনুভব করিয়াই থাকিতে পারি না। জ্ঞান বাহ্য জগতে কার্য্য করিতে গিয়া যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মুখাপেক্ষা করে, অন্তর্জ্জগতেও তাহাকে তাহাই করিতে হয়।

* "নেতি নেতীতি নেতীতি শেষিতং যৎ পরং পদম্।
নিরাকর্ত্তুমশক্যত্বাৎ তদ্মাস্মীতি সুখী ভব॥"

ঈশ্বরের নিকটে যাইতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য পরম্পরা-সম্বন্ধে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে। প্রথম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্য বস্তু, বাহ্য বস্তুর সাহায্যে আত্মা, আত্মার সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাতে ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ রূপে জ্ঞানের আয়ত্ত, এ কথার কোন বাধা উপস্থিত হইল না। কারণ বাহ্যবস্তুজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান যেমন যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঈশ্বরজ্ঞানও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। একেবারে স্বতঃসিদ্ধ না বলিয়া পরম্পরা প্রদর্শন করা কেবল জ্ঞান অভ্যুদয়ের ক্রম দেখাইবার জন্য, এবং ইহাতে বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় এই জন্য।

আমরা যখন জননীর ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া স্তন্য পান করিতাম, তখনই ঈশ্বরের পরিচায়ক অসংখ্য বস্তু বিদ্যমান ছিল। তখন যদি উপযুক্ত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইত, তাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের সংবাদ অতি সহজে লাভ করিতে পারিতাম। চিন্তাপথে আপনাকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিয়া যখন দেখি জননী এক অনির্ব্বার্য্য প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমাকে লালন পালন করিতেছেন; যখন দেখি সে প্রকৃতিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার তাঁহার শক্তি নাই, অনেক সময় বিরক্ত হইয়া, অথবা ক্লেশবহনে অসমর্থ হইয়া ভালবাসিতে চাহেন না; অথচ ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পা-

রেন না; যখন দেখি প্রবল শীতের সময় দুঃখিনী জননী স্বয়ং অনাবৃত শরীরে থাকিয়া অসীম দুঃখরাশি বহন করিতেছেন, অথচ যাহা কিছু আচ্ছাদন সম্বল ছিল, সমুদায়ে আমার শরীর আবৃত করিতেছেন, দুর্গন্ধময় আর্দ্র শয্যায় নিজে শয়ন করিয়া আমাকে শুষ্ক ও পরিষ্কৃত শয্যায় রাখিতেছেন; যখন দেখি অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার মল মূত্রাদি ধৌত করিতেছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও অনিচ্ছা বা বিরক্তির ভাব নাই; এই সকলের মূল কারণ কি যদি একবারও সে সময়ে চিন্তা করিয়া দেখি, তখনই হৃদয়ে ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্পষ্ট বিস্ফুরিত দেখিতে পাই।

আবার দেখি সেই স্নেহের প্রতিমার সহিত আমার অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বাল্যকালে আমি সর্ব্ব বিষয়ে অক্ষম। শয়ন, ভোজন, গমন, বাক্যদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করণ, ইহার কিছুই করিতে পারি না। রোগ কি, সুস্থতা কি, হিত কি, অহিত কি, পথ্য কি, অপথ্য কি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি আপনি আপনার কোন বিষয় নিশ্চয় করিতে কি তদনুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ। এমন কি আমি ভুজঙ্গের মুখে হাত দিতেও সঙ্কোচ করি না। এ অবস্থায় সেই স্নেহের প্রতিমা জননী ভিন্ন আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন বাঁচাইতে পারি না। কোথা হইতে জননী আসি-লেন? জননীর অনিচ্ছাসত্ত্বে সেই স্নেহরস কোথা

হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; এবং সে স্নেহে আমার এত উপযোগী কে করিয়া দিল, এ সকল কথা চিন্তা করিলে কি আর ঈশ্বরকে বুঝিবার বাকী থাকে? আবার দেখি জননী আমার শরীরপোষণ জন্য স্তন্য দান করেন। সে স্তন্যের প্রতিও তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। যখন তাঁহার শরীর রুগ্ন হয়, অথবা শারীরিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তখন ইচ্ছা ও যত্ন করিয়া জননী স্তনে দুগ্ধ আনয়ন করিতে পারেন না; আবার যখন সুস্থ ও সবল শরীরে থাকেন, তখন আপনা হইতে এত দুগ্ধ প্রবাহিত হইয়া পড়ে যে সেই প্রবল দুগ্ধপ্রবাহ নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাকে পীড়ার হস্তে পড়িয়া কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; যখন দেখি স্তন্য দুগ্ধের প্রতি জননীর নিজের কোন ক্ষমতা চলে না, এবং কেবল আমার জীবন রক্ষার উপায় ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনেও আইসে না, তখন সেই স্তন্যের স্রষ্টা স্নেহময় পিতাকে না বুঝিয়া আর থাকিতে পরি না।

শিশুকাল অতিক্রম করিয়া বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিপাক হইল, বয়ঃক্রমও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, এখন জননীর নিকট হইতে ক্রমে২ সংসারের দিকে চলিলাম, সম্মুখে বিস্তৃত পরিবার। তন্মধ্যে প্রথম পিতাকে পরম পিতার প্রতিনিধি-রূপে প্রাপ্ত হইলাম। আমার সুখের জন্য পিতা কত ক্লেশ বহন করেন, কত যত্ন করিয়া আমার জন্য আহার ও পরি-

চ্ছদ যোগাইয়া দেন; আমাকে পবিত্র, বিনীত, সুশীল ও ধর্ম্মানুরক্ত দেখিলে, আমাকে সুস্থ ও সবল শরীর দেখিলে পিতার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আমি যখনই চিন্তা করি তখনই দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত দিন কেবল আমার মঙ্গল চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়। আমাকে আহার করিতে দেন মঙ্গলের জন্য, আহার করিতে নিষেধও করেন মঙ্গলের জন্য, দণ্ড দেন মঙ্গলের জন্য, পুরস্কার দেন মঙ্গলের জন্য। আমার প্রতি যাহা কিছু করিতে দেখি সকলেরই উদ্দেশ্য কেবল আমার মঙ্গল। আমার আহারের নিয়ম, আমার শয্যার নিয়ম, আমার বস্ত্রের নিয়ম, যখন পিতাকে এই সকল নিয়মকর্ত্তারূপে সম্মুখে দেখিতে পাই, তখন সমস্ত মঙ্গলের আধার সেই পরম পিতাকে আর না বুঝিয়া থাকিতে পারি না।

আবার পিতাকে ছাড়িয়া খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ তাত প্রভৃতির নিকটে গেলে আরও নূতনরূপে তাঁহার প্রেমের সংবাদ পাই। মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভ্রাতা ভগিনী যাঁহার নিকটে যাই, তাঁহারই মুখজ্যোতিতে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের স্নেহমাখা সম্বোধন, স্নেহমাখা দৃষ্টি, স্নেহমাখা আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন প্রভৃতি যেমন অকৃত্রিম মনোহর, তেমনই সেই পরম পিতার পরিচায়ক। এই সকল সুখের পরিবার কোথা হইতে আসিল? কে এমন সুখের পরিবার মধ্যে আমাকে সংস্থা

পিত করিল ? এ চিন্তা কি বিরাম পায় যতক্ষণ সেই বিশ্বপিতার সুন্দর পরিচয় না পাইতে পারি ?

ইহা অপেক্ষা যখন বুদ্ধি পরিস্ফুট ও পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল, তখন নিজের শরীর ও জগতের সাধারণ কার্য্য প্রণালীর উপর দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নিজের শরীরে দেখি হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অপূর্ব্বসাধন ও অলঙ্কার বিদ্যমান। ইহার প্রত্যেক সাধনের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্য যদি চিন্তা করি তবে একেবারে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই।

প্রথম হস্ত। হস্ত এক অদ্ভুত প্রয়োজনীয় সাধন। হস্ত যদি এক দিন বিকল থাকে, তবে সকল সংসারকে অসার বলিয়া বোধ হয়। হস্তের গঠন ও পরিমাণ এবং উপযোগিতার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। ইহার দৈর্ঘ্য, ইহার আয়তন, ইহার সন্ধি সকল অতি নির্দ্দোষ ও প্রয়োজনীয়। ইহার অঙ্গুলি সকল কোনটী হ্রস্ব কোনটী দীর্ঘ, কিন্তু এই রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ না থাকিলে কার্য্য চলে না এবং দেখিতেও সুন্দর হয় না। আমরা যত ভাবি, ততই ইহার মধ্যে অদ্ভুত বিচার শক্তির পরিচয় পাই।

তার পর পদ। পদের বিষয় চিন্তা করিলে আপনাকে কত সুখী সৌভাগ্যশীল বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর। ইহার প্রয়োজনীয়তা ইহার নির্দ্দোষ গঠন-প্রণালী অতি অপূর্ব্ব। ইহার সমুদায় বিষয় বিস্তার করিয়া

লেখা নিষ্প্রয়োজন। কেননা প্রতিপদনিক্ষেপে প্রত্যেক মনুষ্যই তাহা সুন্দররূপে অনুভব করিতেছেন।

অতঃপর চক্ষু। চক্ষু না থাকিলে আমার সম্বন্ধে বাহ্য জগৎ থাকা না থাকা তুল্য হইত। আমি সেই পরমোপকারী চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত এক পদও চলিতে পারি না, এবং আমার প্রয়োজনীয় 'একটী বস্তু বাছিয়া লইতে কিম্বা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি না। এমন কি চক্ষুর অভাব হইলে নিজের খাদ্য বস্তু পর্য্যন্ত দেখিতে পারি না। চক্ষু ব্যতীত আমি একেবারে অচল। আবার দেখি এই চক্ষু শরীরের অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। চক্ষু অভাবে অতি রূপবান্ পুরুষও শ্রীহীন বলিয়া প্রতীত হন। সেই চক্ষু এমন সুনিয়মে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে যে, তাহার অল্পমাত্রও ব্যতিক্রম করিলে আর সৌন্দর্য্য থাকে না। পদ্ম যেমন কোমল, সুতরাং নির্জ্জল স্থানে থাকিলে শুকাইয়া যায়, চক্ষুও সেইরূপ কোমল পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া তাহা সর্ব্বদা সজল ভাবে অবস্থান করে। আবার বাহ্য জগতের নানা প্রকার ঘটনাতে সেই সুন্দর চক্ষু অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে, এ জন্য অতি সুন্দর কৌশলময় দুইটী কবাটে তাহা আবৃত হইয়াছে। সেই কবাট এমন সুন্দর কৌশলে ব্যবস্থাপিত যে, বিপদ উপস্থিত হইলে সে আপনা হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে, কর্ত্তার কিছু মাত্র চেষ্টার প্রয়োজন

করে না। আবার সেই পার্শ্বস্থ কবাট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ লোমরাজিতে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা বাহিরের আলোক ও উত্তাপ, কীট ও বালুকাকণাদি হইতে চক্ষু রক্ষিত হইতেছে। চক্ষুর ন্যায় প্রয়োজনীয় বস্তু, একটী হইলে বিলক্ষণ ত্রুটি হইত, কারণ দৈবাৎ একটী বিনষ্ট হইলেই সমুদায় জগৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। একটী নষ্ট হইলেও অন্যটীর দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে, এজন্য চক্ষু দুইটী হইয়াছে। এই চক্ষুর দর্শনশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। যত সূক্ষ্ম ও দূরস্থ বিষয় অবলোকন করিতে না পারিলে অনিষ্ট সম্ভব, চক্ষু তাহা সকলই দর্শন করিতে সক্ষম। আবার উহার যে অংশ দৃষ্টির কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা একটী ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার শক্তি এত ব্যপক যে, সে এক পলকে অর্দ্ধ জগৎ নিরীক্ষণ করিতে পারে। এই দর্শন শক্তি এত শীঘ্রগামী না হইলে আমাদিগের কার্য্য অচল হইত।

তার পর কর্ণ। কর্ণ যে বিষয়ে উপযোগী বাহিরে তাহার সমুদায় সামগ্রী বিদ্যমান। শব্দশ্রবণ কর্ণের বিষয়, কিন্তু উহা কেমন আশ্চর্য্য ভাবে আমাদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করে তাহা চিন্তা করিলেও অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ণের স্থান ও রচনাপ্রণালী কেমন অতিনিগূঢ়-কৌশলসম্পন্ন এবং তাহা দ্বারা মানুষ কেমন সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কাহার সাধ্য এইরূপ কৌশলপূর্ণ

যন্ত্রের অনুরূপ প্রকৃত করে ? এই পৃথিবীতে সুমধুর সঙ্গীত ও বাদ্যনিনাদ, জননীর স্নেহ বাক্য, পিতার আশীর্ব্বাদ গুরুর উপদেশ, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্রাদির সুমধুর সম্ভাষণ, শত্রুর কর্কশ বাক্য ও কঠোর বজ্র নিনাদ, এ সকলই কর্ণের উপযোগী। কর্ণ না থাকিলে এ সকল সুখ কি রূপে অনুভব করিতাম, এবং ইহার মধ্যে ভিন্নতা নির্দ্দেশই বা কি রূপে করিতাম ? ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যদি আমাদিগের কর্ণ না থাকিত জগতের অধিকাংশ সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হইত।

নাসিকাও আমাদিগের পরমোপকারী যন্ত্র। এ যন্ত্রের শক্তি ও উপযোগিতা অদ্ভুত। আপাততঃ দেখিতে নাসিকাতে কেবল দুইটী বিবর মাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার নিগূঢ় কৌশলনিচয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা থাকে না। জগতে যত পদার্থ আছে, সকলই গন্ধের আবাস। কখন কোন গন্ধ বিষপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহা দ্বারা জগতের নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে; কখন বা গন্ধ জগতের প্রাণ বিতরণ করিতেছে। সুগন্ধ পুষ্প, সুগন্ধ খাদ্য, ও সুগন্ধ প্রাণবাহী ঔষধ এ সকলই নাসিকার বিষয়। কোন্ গন্ধে শরীরনাশক বিষশক্তি অবস্থান করে, কোন্ গন্ধে জীবনীশক্তি অবস্থান করে, কোন্ গন্ধ সুখের ও কোন গন্ধ দুঃখের, তাহা নির্ব্বাচন করা নাসিকার কার্য্য। নাসিকা ভিন্ন এ সকল কার্য্য অবধারিত

হইতে পারে না। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, ইহা নানাবিধ সুগন্ধ দুর্গন্ধের আধার। এখানে নাসিকা না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না। নাসিকা বিবরযুক্ত না হইলে ঐরূপ গন্ধ প্রবাহ পরিচালিত হওয়া অসম্ভব হইত। আবার ঐ নাসিকা বিবর যদি লোমযুক্ত না হইত, বায়ুকে বিশোধিত করিয়া কে অভ্যন্তরে লইয়া যাইত? প্রত্যেক বায়ুপ্রবাহে ধূলিপ্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ অভ্যন্তরে নীত হইয়া প্রাণবিনাশ হইত। নাসিকা যে স্থানে আছে, ঐরূপ স্থান ভিন্ন মনুষ্য এক বিকটাকার জন্তু হইত। বিনা কর্ত্তা ও বিনা চিন্তাতে কি এমন সুন্দর ও উপযোগী সাধন প্রস্তুত হইতে পারে?

ইহার পর রসনা। রসনাও এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহাতে বস্তু নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাহার কটুত্ব, তিক্তত্ব, অম্লত্ব, মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ বাহির হইয়া পড়ে; সুস্বাদ কি বিস্বাদ অবধারিত হয়। আপাততঃ দেখিলে জিহ্বাকে এক খণ্ড পেশীময় মাংসফলক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উহার আশ্চর্য্য শক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে নিয়ন্তার বিচারশক্তি, নিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছা, নিয়ন্তার উচ্চ অভিপ্রায় বুঝিবার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত শরীরই চর্ম্ম, মাংস, পেশী ও ঝিল্লি প্রভৃতি উপাদনে নির্ম্মিত, কিন্তু জিহ্বাতে তেমন গুণনির্ব্বাচক শক্তি কোথা হইতে আসিল? শরীরের অন্য স্থানেই বা তাদৃশী শক্তি দৃষ্ট হয় না কেন?

এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। জিহ্বাতে ঐরূপ শক্তি থাকা প্রযুক্ত তাহা আমাদিগের খাদ্য বস্তু নির্ব্বাচনে নিতান্ত উপযুক্ত হইয়াছে। জিহ্বা না থাকিলে আমাদিগের কত যে অমঙ্গলের সম্ভব ছিল, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ।

তার পর দন্ত। আমরা যখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, যখন দুগ্ধ ভিন্ন আমাদিগের আহার ছিল না, তখন আমাদিগের দন্তও ছিল না। দন্ত নিষ্পেষণ ছেদন বিদ্ধ করণ প্রভৃতি কার্য্যের সাধন। যখন দুগ্ধ মাত্র আহার ছিল, তখন এ সকল কার্য্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না। যখন কঠিন বস্তু আহার করা প্রয়োজন হইল, তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে মাংসরাশি ভেদ করিয়া দন্ত সকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাহির হইল। এতদ্ব্যতীত ওষ্ঠ, তালু, চর্ম্ম, লোম, নখ ও কেশ প্রভৃতি বাহ্য জগতের উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় সজ্জানিচয়ে আমাদিগের শরীর সুসজ্জিত হইয়াছে। এ সকল সজ্জার অভ্যন্তরভাগে আবার যাদৃশ সুনিপুণ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার প্রত্যেক সজ্জা সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম মঙ্গল ভাব ও বিচার শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই অপূর্ব্ব কৌশলই প্রসিদ্ধ প্রাচীন শবচ্ছেদক চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞের কঠোর নাস্তিকতা চূর্ণ করিয়াছিল। এ সকল আমাদিগের পরম সম্পদ্।

আমরা যখন জননীগর্ভে বাস করিতেছিলাম, তাহার প্রথমাবস্থায় আমাদিগের এ সকল সম্পদ কিছুই ছিল না। এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে এক জন জ্ঞানবান্ পুরুষ হইতে আমরা এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং এই সকল সম্পদ্ লইয়া এই অজ্ঞাত পৃথিবীতে আসিয়াছি। পৃথিবীতে আসিলে আমাদিগের এ সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, ইহা বিবেচনা করিবার কেহ না থাকিলে কি প্রকারে আমরা এই সকল লাভ করিলাম? বিবেচনা ব্যতীত উপযুক্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু বিবেচনা কাহার? বিবেচনা কখন শূন্য হইতে আসিতে পারে না, তাহার পাত্র থাকা আবশ্যক।

আবার যখন গর্ভাশয়ের কার্য্যপ্রণালী অনুসন্ধান করি, তখন ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। যেরূপে গর্ভ সংস্থিত হয়, যে রূপে তাহা পুষ্ট হয়, যে রূপে শারীরিক উপাদানসকল সংগৃহীত হয়, যে রূপে রক্ষিত ও সজীব হয়, তাহা ভাবিলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া যায়। ভ্রূণের আহার, ভ্রূণের অবস্থানোপযোগী আবাস, তাহার শরীর পোষণোপযোগী বায়ু, যাহা প্রয়োজন কিছুরই অভাব দেখা যায় না। কোথা হইতে সেই অভাব সকল পূর্ণ হয়, কে তাহার উপযোগিতা নিশ্চয় করে, কি অভাবনীয় কৌশলে অতি সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, তাহা চিন্তার অতীত। সেই অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তির আধার ঈশ্বর ভিন্ন কি এ

সকল কার্য্য হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, আমরা প্রকৃতি হইতে এ সকল পাইয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা প্রভৃতি সেই প্রকৃতির গুণ, কিন্তু প্রকৃতি অন্ধ। প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই, সুতরাং যাঁহারা তাদৃশ কুতর্ক দ্বারা নাস্তিকতা আনয়ন করেন, তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ অন্ধ।

আমাদিগের দেশীয় তান্ত্রিক ও পৌরাণিকগণ ঐ প্রকৃতিকে ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শাক্তগণ ইহাকে জড় শক্তি বলেন। কেহ বা প্রকৃতি বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন। যাঁহারা প্রকৃতিকে ঐশী শক্তি বলেন, তাঁহারা বড় মন্দ বলেন না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের নির্দ্দেশের মূল নাই। যাঁহারা প্রকৃতিকে জড়শক্তি বলেন, তাঁহাদের প্রকৃতি তেমন গুণ সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহাতে সৃষ্টি হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জড় প্রকৃতি অন্ধ। ঐরূপ জড় প্রকৃতি দ্বারা কদাচ জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। যদি প্রকৃতির তেমন শক্তি থাকিতে পারে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক যদি তেমন সুন্দর ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, তবে আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিব, অর্থাৎ ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন যে সেই ঈশ্বর। আশ্চর্য্য!! ইঁহারা একটী অন্ধ শক্তির উপরে জগতের সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া সুখী হইতে

চান, তথাপি ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে চান না। ঈশ্বরের প্রতি কেন যে ইঁহাদের এত আক্রোশ, তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। দূষিত নীতি নাস্তিকতার মূল অনেকে বলিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ অন্ধ প্রকৃতি জগতের স্রষ্টা হইলে স্বেচ্ছাচারিত্বে বিলক্ষণ সুযোগ হয়। যাউক, এখানে এ বিষয় লইয়া বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ইহার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিয়স্তৃত্ব বুঝিবার যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার আত্মা আছে, জ্ঞান আছে, হৃদয় আছে, তাহাই তাহার বিশ্বাসের জন্য দৃঢ়তর ভিত্তি স্বরূপ।

যদিও জননী, নিজের শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য পরিবার সকলই ঈশ্বরের অকাট্য পরিচয় স্থল, তথাপি আমাদিগের বয়ঃক্রম যত বাড়িতে থাকে, জ্ঞান যত প্রশস্ত হইতে থাকে, সম্মুখে জ্ঞাতব্য বিষয় যত অসীমরূপে বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আর শুদ্ধ উহাতে জ্ঞান তৃপ্ত থাকিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত সংসার কার্য্যক্ষেত্র হয়। আমরা পরিবার ও আপনাকে ছাড়িয়া দূরেও ঈশ্বরের সংবাদ লইতে যাই।

যখন পরিবার ও আপনাকে ছাড়িয়া সমাজে যাই, তখনও ঈশ্বরের বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হই। তথাকার ঐক্য ভাব, তথাকার কার্য্যপ্রণালী, তথাকার কৃতজ্ঞতা ও প্রেম অতি চমৎকার। সেই স্থানে গিয়া দেখি কেহ

ক্ষেত্র কর্ষণ করে, কেহ বস্ত্র প্রস্তুত করে, কেহ দূর দেশে গিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু আনয়ন করে, কেহ অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। এই রূপে নানা লোক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এমন সুন্দর বিনিময়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে যাহাতে সকলেরই সকল অভাব দূর হইতেছে। এস্থানে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের ভাব, রাজা ও প্রজার ভাব, প্রভু ও ভৃত্যের ভাবও চমৎকার। দেখিলেই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। মনুষ্য সাহায্যসাপেক্ষ জীব, জনসমাজ ভিন্ন তাহার এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবার উপায় নাই। সংসারে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমুদায়ই অনেক লোকের একমত ব্যতীত হয় না, সুতরাং সমাজ আমাদিগের নিতান্ত উপযোগী। এরূপ সমাজবন্ধন ব্যতীত মনুষ্যের চলে না। রাজা না হইলে প্রজার চলে না, প্রজা না হইলেও রাজার চলে না। কৃষক না হইলে শস্যোৎপন্ন হয় না, শস্যোৎপাদন ব্যতীত মনুষ্যজীবন বাঁচে না। এইরূপ অন্যোন্যসাপেক্ষতা হইতে সমাজবন্ধন ও পরস্পরের সদ্ব্যবহার দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের বিচিত্রতার পরিচয় অতি সুন্দররূপে প্রাপ্ত হইতে পারি।

আবার লোকসমাজ ছাড়িয়া যদি পশুরাজ্যে যাই, সেখানেও ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা দেখিতে পাই। তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহাদিগের বিচিত্র গঠনপ্রণালী, তাহা-

দিগের শরীরের লোমরাজি, তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর মিলন ও পরিমাণ অতি আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহাদিগের সকল বিষয়ই অতি সুশৃঙ্খল এবং উপযোগী। কাহার শৃঙ্গ আছে, কাহার শৃঙ্গ নাই। কাহার খুর, কাহার নখর, কাহার খুর অখণ্ডিত, কাহার খণ্ডিত। সকলেই আপন প্রয়োজনোপযোগী সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও এক বিন্দু বিশৃঙ্খলা বা অনুপযোগিতা নাই। যাহার যেমন খাদ্য ও বাসস্থান হওয়া উচিত সে তাহাই পাইয়াছে, খাদ্য বেশীই আছে, কম নাই।

এইরূপ পক্ষীদিগের মধ্যে অন্বেষণ করিলেও ঈশ্বর অপরিচিত থাকিতে পারেন না। ইহাদিগের পক্ষ, ইহাদিগের শরীরাবরক পত্র, ইহাদিগের চঞ্চু ও পদ এবং পদের অঙ্গুলী ও নখ সকলই চমৎকার ও প্রয়োজনোপযোগী। ইহাদিগের স্নেহ মমতা, ইহাদিগের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ইহাদিগের সন্তানপালনের নিয়ম যেরূপ হওয়া উচিত, যাহার যেরূপ হইলে সুন্দর চলিবে, কোন ক্লেশ যন্ত্রণা হইবে না, তাহাকে তাহাই প্রদত্ত হইয়াছে। কাহারও উড়িবার শক্তি কম, কাহারও অধিক। যাহার কম, তাহার শরীরের আয়তন ও গুরুত্ব অধিক। যাহার উড়িবার প্রয়োজন অধিক, তাহার শরীর ক্ষুদ্র ও লঘু। কাহার কাহার কণ্ঠস্বর ও বাক্‌শক্তি অতি মনোহর, এবং অবস্থা

ভেদে বুদ্ধিশক্তিরও অভাব নাই। কুলায়নির্ম্মাণ, খাদ্যাহরণ, বিপদ্ হইতে আত্মমোচন, তজ্জন্য স্থাননিরূপণ প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক। ঈশ্বর ব্যতীত এমন সুন্দর শিক্ষা, সুন্দর অঙ্গাবরণ, ও অঙ্গোপাদান, সুন্দর কণ্ঠস্বর ও বাক্‌শক্তি তাহারা কোথায় পাইল?

এইরূপ মৎস্য প্রভৃতি জল জন্তু ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণের বিষয় যত আলোচনা করি, ততই ঈশ্বরের সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হই। যাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করি, সেই তাঁহার পরিচয় প্রদান করে, কেহ কোন সন্দেহ রাখে না। আবার প্রাণীদিগকে ছাড়িয়া যদি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে যাই, সে স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হই। তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বট, অশ্বত্থ, শমি, খদির প্রভৃতি মহাবৃক্ষ, বংশ প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা, পুষ্পবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, শাক সূপ, ওষধি প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে লইয়া চিন্তা করি, জিজ্ঞাসা করি, তাহারাই নিকট তাঁহার পরিচয় পাই। ইহাদিগের নির্ম্মাণকৌশল ইহাদিগের অবস্থার ব্যবস্থা নিতান্ত উপযুক্ত, সেই সেইরূপ না করিয়া দিলে তাহাদিগের ও আমাদিগের চলিত না। সুতরাং শিরা, বল্কলী, রসাকর্ষণশক্তি ও আকৃতিপ্রভৃতি নিতান্ত উপযোগী করিয়া সজ্জিত হইয়াছে। গুণ, রস, ফল পুষ্প সকলই উপযুক্ত। এইরূপ প্রয়োজনানুসারে মূল, স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা

পত্র, বল্কল, ফল ও পুষ্পাদির ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক না হইলে হয় না। মহাবৃক্ষ সকলের কার্য্যোপযোগিতা, ব্যঞ্জন দ্রব্যের সারবত্তা ও রসালতা, ওষধি সকলের শরীর পোষকতা, ঔষধি সকলের রোগ নিবারকতা আলোচনা করিলে হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাতে অবনত হইয়া পড়ে। সে ভক্তি ও সে কৃতজ্ঞতার পাত্রকে, এই বলিয়া যদি প্রশস্ত ও নির্ম্মল হৃদয়ে ডাকি, অমনি সেই অনন্ত প্রেমের আধারকে সম্মুখে দেখিতে পাই।

জগৎ পুস্তক, ঈশ্বর অভিধেয়। জগৎ লক্ষণ, ঈশ্বর লক্ষ্য। জগৎ বাচক, ঈশ্বর বাচ্য। জগৎ আবির্ভাব, ঈশ্বর ভাব। জগৎ কার্য্য, ঈশ্বর কারণ। এই পুস্তকের প্রতি যত মনোযোগ দিয়া পাঠ করিব, ততই ইহার অভিধেয়কে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। এই লক্ষণ সকল যত আলোচনা করিব, ততই ইহার লক্ষ্য বস্তু সুন্দররূপে চিনিতে পারিব। ইহাকে যত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিব, ততই তাঁহার দর্শনের উপায় শুনিয়া কৃতার্থ হইব। বাহিরে দেখিয়া যত ভিতরের দিকে তাকাইব, ততই উজ্জ্বল ভাবে তিনি দর্শন দিবেন। উৎপন্ন দেখিয়া উৎপাদক বলিয়া যত ভাবিব, ততই তাঁহাকে নিকটে পাইব।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অন্ন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্ত্র বিতরণ করিতে দেখিলে যেমন অতীন্দ্রিয় দয়া,

ইন্দ্রিয়ব্যাপার ঔষধ বিতরণ দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় পরোপকারিতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অশ্রুজল দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় হর্ষ শোক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভীতকে দেখিয়া যেমন অতীন্দ্রিয় ভয়কে না বুঝিয়া থাকিতে পারা যায় না; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ দেখিয়া, জগতের শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিয়া, অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে না বুঝিয়া থাকিতে পারি না। বিষয় বুঝিতে যেমন ইন্দ্রিয় সহায়, আত্মা বুঝিতে যেমন বুদ্ধি সহায়, ঈশ্বরকে বুঝিতে তেমনি প্রজ্ঞা সহায়। ঈশ্বর যুক্তি ও তর্কের ফল নহেন, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল। যেমন কার্য্যকারণের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন বস্তুগুণের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন ঐক্যানৈকের ভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরের ভাব স্বতঃসিদ্ধ ইহা আত্মা ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই মনুষ্য আপনা আপনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ তাহাকে শিক্ষা দান করে নাই। মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে অবিনশ্বর প্রজ্ঞা ধন লাভ করিয়াছে, সেই ধনের বলে সে যেমন সকল সম্পদ্ পায়, সেইরূপ সে আপন হৃদয়স্থ অক্ষয় ধনের বলে ঈশ্বরকেও পাইতে পারে। আমার নিজের অস্তিত্ব বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল, ঈশ্বরের সত্য ভাবও সেই রূপ স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফল। আমি আছি কি না জগৎ আছে কি না, ইহা লইয়া যেমন কেহ তর্ক করে না, কিন্তু বিশ্বাস করে, ঈশ্বর আছেন

কিনা, ইহা লইয়াও তেমনি কেহ তর্ক করে না, কিন্তু বিশ্বাস করে।

সকলেই যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করে, তবে নাস্তিকতা কোথা হইতে আসিল? আমি বলি নাস্তিকও স্বতঃসিদ্ধরূপে ঈশ্বরকে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ মুখে স্বীকার করে না। মনুষ্যের স্বভাব যখন সংসারের নানা কৃত্রিমতাতে পড়িয়া বিকৃত হয়, তখনই উহা বলপূর্ব্বক হৃদয়ের বিশ্বাসকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। যখন ঈশ্বরদত্ত সম্পদ্ পাইয়া মনুষ্য অসহায় হয়, যখন সে চতুর্দ্দিক্ হইতে সাহায্য পাইয়া গর্ব্বিত হয়, যখন সে আপনাকে ধনী, মানী, জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করে, যখন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, তখনই সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া বাঁচিতে চায়। কিন্তু সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারে না। কত অহঙ্কারী ও গর্ব্বিতদিগকে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা বহুকাল ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াও যখন সকল সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন পুনর্ব্বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে। যখন অহঙ্কারের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, যখন সে আপনার শক্তি বুঝিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায় যে তাহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, সে এক বিষয় বুঝে আর এক বিষয় বুঝে না, একটী কার্য্য করিতে পারে, হয় তো অন্যটী করিতে পারে না, এক বস্তু দেখিতে পায় অন্য

বস্তু দেখিতে পায় না, আপন অন্তরনিহিত ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও সে অতিক্রম করিতে পারে না, অথচ সে ক্ষুধা তৃষ্ণাকে তাহার দেহের নিতান্ত উপযোগী বলিয়া বুঝিতে পারে; তখন সে আপনাকে নিঃসম্বল ও অসহায় জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। এ সকল বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। জগতে মনুষ্যচরিত্র পাঠ করিলে ইহার অসংখ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের অন্তরে যে নির্ভরের ভাব আছে, যদি তাহার প্রতি মনোযোগ করি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচে না। অতি বাল্যে জননীর প্রতি, তৎপর জনকের প্রতি, তার পর গুরুর প্রতি মনুষ্য নির্ভর করিয়া বাঁচে; কিন্তু যখন ইহাদিগের ক্ষমতা, ইহাদিগের বল, ইহাদিগের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিমাণ জানিতে পাইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে ইহারা সকল প্রকার বিপদে আমাদিগের সহায়তা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারে না, তখনই সকল আশ্রয় ছাড়িয়া মনুষ্য দৌড়িয়া ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হয়। মনুষ্য কখন নিরাশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কিরূপে অনুভব করা যায়, কি উপায়ে তাঁহাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইল। ঈশ্বর কিরূপ? তাঁহার লক্ষণ কি? এ সকল বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। এসকল বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবার এ স্থান নহে। উপাসনাতত্ত্ব

লিখিবার সময়ে সে সকল বিশেষ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সপ্তম অধ্যায়।

গুরু বা আচার্য্য।

ঈশ্বর এবং জগৎ এই দুয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম ধর্ম্ম। অথবা ঊর্দ্ধে অনন্ত ঈশ্বর নিম্নে জগৎ, এই দুই দিকে মনুষ্যের যে দুইটী কর্ত্তব্যের স্রোতঃ প্রবাহিত আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। অতি অল্প কথায় ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক গুরুত্ব ও বিভাগ অল্প নহে। এই সম্বন্ধ অনুভব করিবার এবং এই সম্বন্ধোচিত কার্য্য করিবার শক্তি মনুষ্য ব্যতীত আর কাহারও নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধের ভাব জগতের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ থাকিলেও মনুষ্যই উহার একমাত্র বিশ্রাম স্থান। কিন্তু মনুষ্যজাতির অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নহে। কাহারও মনে স্বতঃ ধর্ম্মভাব উদিত হইয়া তাহাকে ও সমাজকে অলঙ্কৃত করে। কেহ বা সহস্র প্রকার উপদিষ্ট হইলেও নানা কলঙ্ক আনিয়া আপনাকে ও সমাজকে কলঙ্কিত করে। যেমন নির্ঝর নিঃসৃত জল বস্তুতঃ নির্ম্মল, কিন্তু মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাজাত বস্তুর শক্তি অনুসারে তাহার

অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন বায়ুর প্রকৃতি একরূপ হইলেও স্থানবিশেষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই রূপ মনুষ্যমনের গতি ও ধারণাশক্তিও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং পিতা মাতা পূর্ব্বপুরুষ ও দেশকাল প্রভৃতির অবস্থানুসারে মনুষ্যজাতির মধ্যেও কেহ সুবুদ্ধি, কেহ কুবুদ্ধি, কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কেহ জড, কেহ বাক্‌শক্তি হীন, কেহ শ্রুতিশক্তি হীন ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত ও ভাবান্তরিত হইয়া এই পৃথিবীতে জন্মে। এই সকল কারণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গূঢ় মর্ম্মগুলি শিক্ষা ব্যতীত সকলের মনে নির্দ্দোষরূপে স্বতঃ বিস্ফুরিত হওয়া অসম্ভব। যাহাও কিছু সম্ভব, তাহাও স্থান, শৈশবাদি অবস্থা ও সংসর্গদোষে কার্য্যকর হইতে পারে না; এবং চিন্তাশীলতা ব্যতীত তর্কে বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে না। উপযুক্ত লোকের নিকট উপদিষ্ট হইলে ঐ সকল জটিল দুরূহ বিষয় অল্প পরিশ্রমে, অল্প আয়াসে ও অল্প যত্নে শিক্ষা হয়। শিক্ষা পদ্ধতি থাকিলে উপযুক্ত শিক্ষক থাকাও চাই। যাঁহারা এই শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন সাধারণ ভাবে তাঁহাদিগকেই গুরু বা আচার্য্য বলা যায়। আপাততঃ আমারা এই শব্দটী সাধুচরিত্র সদনুষ্ঠায়ী উপদেষ্টা মানবদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহা মনুষ্যের প্রতি তেমন খাটে না। যদি বল গুরু শব্দে সদুপদেষ্টাকে বুঝাইবে, তাহা হইলেও

উহা মনুষ্যের প্রতি অপ্রযোজ্য। যিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বান্তর্যামী, সেই ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে উপদেশ না দিলে, ঈশ্বরের কৃপা মনুষ্য হৃদয়ে না পড়িলে, মনুষ্যকৃত উপদেশ কখনও কার্য্যকর হয় না*। গুরুর নিকটে যে শিষ্য উপদিষ্ট হইতে যায়, তাহার কারণ—ঈশ্বরের কৃপাপরিচালিত শিষ্যের ইচ্ছা। যদি ঈশ্বরকরুণা হৃদয়ে বিস্ফুরিত হইয়া শিষ্যের ইচ্ছাকে উত্তেজিত না করে, যদি সেই কারণে সে আপনার জীবনের অপবিত্রতা অনুভব করিতে সক্ষম না হয়, যদি আপনার মহান্ অভাবের জন্য তাঁহারই হৃদয় ব্যথিত না হয়, তবে উপদেশ দিলেও সে শুনে না, শুনিলেও মনোযোগ দেয় না। সুতরাং মনুষ্যকৃত উপদেশ কার্য্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আচার্য্য যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে মনুষ্যের অতীত নূতন কিছুই হইতে

---

*শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতাং যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥
বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদবচনং।

সানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
শ্রীমদ্ ভাগবতং।

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
শ্রীমদ্ ভাগবতং।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদেষ গীতার্থসংগ্রহঃ॥
শ্রীধরস্বামী।

পারে না। যাহা পুরাতন, যাহা সহজ, যাহা ঈশ্বরকৃপা প্রসূত, সেই জ্ঞান, সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস উদ্বোধিত হয় মাত্র। অতএব ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, ঈশ্বরই আদি গুরু, ঈশ্বরই চিত্তপ্রভব গুরু। কেননা সহজ জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্যতিত কোন উপদেশই কার্য্যকর হইতে পারে না। যদি তাহা পারিত, তবে গুরুকৃত উপদেশ শুনিয়া পশুপক্ষীও জ্ঞানলাভ করিত।

এত বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে গুরু শিষ্যসম্বন্ধ প্রকৃতিমূলক। কেন না ইহা মনুষ্যের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা হইতে আপনি উদিত হয়। মনুষ্য যখন অভিজ্ঞতা বলে নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে এবং সেই দুর্ব্বলতা দূর করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন সে আপনা আপনি গুরুর জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে; এবং আপন অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কোন মনুষ্যের নিকট হইতে আপনার অভাব সকল দূর করিয়া লইতে যত্ন পায়। কিন্তু এই জন্য যে প্রত্যেক মনুষ্যকেই গুরু স্বীকার না করিলে চলিবে না, এরূপ নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন মনুষ্য আপন অনভিজ্ঞতা বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপায় যখন সে আপন অভাব অনুভব করিতে পারে, তখন সে হয় ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবলে, না হয় গুরূপদেশের বলে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে। অনেক মনুষ্য এমন ভাগ্যবান্

আছেন, অনেকের প্রতি ঈশ্বরের দয়া এমন বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় যে তাঁহারা বিনা উপদেশে আপনা হইতে অনেক সত্য অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অন্যে বহু চেষ্টা করিয়া যাহা আয়ত্ত করিতে না পারে, তিনি ঈশ্বরকৃপায় বিনা অধ্যয়নে সে সকল দেখিতে পান। ধর্ম্ম জগতে যত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ঐরূপ প্রত্যাদিষ্ট সাধুদিগের জীবনের ফল। যাহা হউক, এরূপ মনুষ্য সর্ব্বদা সংসারে জন্মে না। সংসারে সাধারণতঃ যে সকল মনুষ্য পূর্ব্বে ছিল এবং বর্ত্তমানে আছে, তাহারা অল্পজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি, অল্পচিন্তাশীল, অল্পমীমাংসাপ্রিয় ও অল্প-সংস্কৃত। এ জন্য গুরু বা আচার্য্য স্বীকার করা একরূপ প্রকৃতিসিদ্ধ।

আরও এক কথা আছে। যখন সুবিধা আছে, যখন এক জন কৃতবিদ্য সাধুর নিকট গমন করিলে অনায়াসে অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, তখন নিরর্থক কষ্ট পাই-বার প্রয়োজন কি? যৎকালে মনুষ্যগণ নিতান্ত বন্যবেশে কাল যাপন করিত, যখন সকলেই প্রায় তুল্যাবস্থায় ছিল, সে সময়ে কেহ যে কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিবে এরূপ আশা ছিল না, তথাপি মনুষ্যের প্রাকৃতিক অভাব ও দুর্ব্বলতাই তাহাদিগকে পরস্পর সাহায্যের জন্য উত্তেজিত করিয়াছে, এবং সেই কারণেই মনুষ্য জাতি সমাজবদ্ধ হইয়াছে; পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্ন-

তির পথে অগ্রসর হইয়াছে; এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে নীতিসম্বন্ধে শিক্ষকপরম্পরা আশ্রয় করা আবশ্যক বোধ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিনটী মনুষ্যের প্রাকৃতিক অবস্থা। ইহার প্রত্যেক অবস্থার ফল তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার ভোগ্য। যেমন পূর্ব্বে হস্ত পদাদির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া পরে হামাগুড়ির সুবিধা হইয়াছে; যেমন পূর্ব্বে জিহ্বা ও ওষ্ঠ ছিল বলিয়া দুগ্ধ চুষিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে; যেমন এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ ছিল বলিয়া বিষয়জ্ঞানলাভ সহজ হই-য়াছে; সেই রূপ বাল্যের উপার্জ্জিত শিক্ষাই যৌব-নের ভোগ্য হইবে এবং যৌবনের নৈপুণ্য ও কর্ম্মিষ্ঠতাই বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ও আনন্দপ্রদ হইবে। অতএব বাল্য-কালে মানবহৃদয়ে সহজে যে অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, তাহার পুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা চাই। সেই সহজ জ্ঞানের অঙ্কুরকে পোষণ করিবার জন্যই উপযুক্ত আচার্য্যের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। নতুবা শিশুর হৃদয়স্থ জ্ঞানাঙ্কুর অতি সহজে ভগ্ন শুষ্ক নির্জীব ও নিষ্প্রভ হইতে পারে; অথবা কুটিলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া মন্দ ফল প্রসব করিতে পারে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই বাল্য হইতে আচার্য্যস্বীকার কর্ত্তব্য। যিনি বিশেষরূপে ঈশ্বরপ্রসাদ প্রাপ্ত হন তাঁহার পক্ষেও উহা অকর্ত্তব্য নহে; বরং কর্ত্তব্য বলিয়াই প্রায় পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে এই প্রথা

চলিযা আসিতেছে। আমাদের জন্মস্থান ভারতভূমিতেও ইহা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবাসীদিগের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই আতিশয্যদোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় আচার্য্যগণ ঈশ্বরের আসনে উপবিষ্ট হইতে সঙ্কোচ করেন না। তাঁহারা ঈশ্বরার্পিত পূজা, ও ঈশ্বরার্পিত স্তব স্তুতি * স্বযং গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ঈশ্বরার্পিত দ্রব্যাদি লইয়াই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, এবং ছল, বল, কল, কৌশলে উপদিষ্ট ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। আবার ভবিষ্যৎ কল্পিত নরকাদির ভয় প্রদর্শন করিয়া শিষ্যের উপার্জ্জিত ধন ঐশ্বর্য্যাদি হরণ করিতেও কুণ্ঠিত বা ভীত নহেন। তাঁহারা বৈধ ও ব্যবস্থেয় বলিযা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত প্রতিজ্ঞাবাক্য † পাঠ করাইতেও পাপ মনে করেন না। যদি এই রূপ হইল, তবে গুরুর গৌরব রহিল কৈ ‡? গুরুর গুরুত্ব পদ কি জন্য? ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে গেলে কি কি বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা

* গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা সাপূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।

† আত্মদারাদিকঞ্চৈব সর্ব্বং গুরুভ্যো নিবেদয়েৎ।

‡ গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভো গুরুরেকোহি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

দেখাইয়া দিতে পারেন এই জন্য *। গুরু যদি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেন, তবে আর সে প্রয়োজন রহিল কৈ? যে ভৃত্য স্বয়ং প্রভুরূপ ধারণ করিয়া প্রভুর জন্য উপহৃত দ্রব্যাদি ও পূজাবন্দনাদি স্বয়ং অপহরণ করেন, তিনি যে প্রভুর দ্রব্যাপহারী চোর তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ আচার্য্যকে চৌর্য্যাপবাদ হইতে রক্ষা করিবার কি পথ আছে? কখনই না।

কেবল এই রূপ করিয়াও ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যাহা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহার জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে দায়ী, যাহার অভাবে তাঁহাদিগের সমস্ত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই উপদেশকার্য্যেও তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে উপদেশ দিতে হইবে? উপদেশের বিষয় কি? জটিল ও অপ্রাঞ্জল শাস্ত্রসকলের মীমাংসা কি? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উপদিষ্ট ব্যক্তি পাপ, তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারিবে, এ সকল কথা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করেন না। মনেই বা করিবেন কিরূপে? যাঁহারা নিজে সহস্র সহস্র পাপের কূপে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা পরের উদ্ধারের উপায় করিবেন কিরূপে? যাঁহারা বায়ুবিক্ষিপ্ত

* তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥ [শ্রীমদ্ভাগবতং]

তুষের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবেন কিরূপে? যাঁহারা ভ্রমেও কখন ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁহারা সে পথের বিঘ্ন বিপত্তি জানিবেন কিরূপে? নিজে না জানিয়াই বা অন্যকে উপদেশ দিবেন কি প্রকারে? যেমন বণিক্‌গণ পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায় করেন, এবং তদ্দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই রূপ গুরুতর গুরুর কার্য্যও অজ্ঞ লোকের জীবনোপায়ের ব্যবসায় হইয়াছে।

যে সকল দোষের কথা উল্লিখিত হইল, উহা অতি গুরুতর এবং অনেক সময়ে অপরিহার্য্য হইলেও যে মূল হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা মন্দ নহে। মনুষ্য যখন যে কার্য্য করে তাহা কর্ত্তব্য ও বৈধ জানিয়াই করে, কিন্তু কালে সেই হিত হইতেই সংসারাসক্ত লোকের হাতে পড়িয়া অহিত উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় বীররূপী সাধু আচার্য্যগণ স্বর্গীয় ভাবের আধার ছিলেন, যখন সেই বীররূপী সাধুগণ পদাঘাতে পাপের মস্তক চূর্ণ করিতে সমর্থ ছিলেন, যখন তাঁহাদিগের লেশমাত্রও স্বার্থপরতা ছিল না, যখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমে, সত্যনির্ব্বাচনে ও সত্য পালনে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, যখন মনুষ্যগণ বুঝিয়াছিল তাঁহারা দয়া ও প্রেমের অবতার, যখন তাঁহাদিগের স্বর্গীয় বীরত্বদর্শনে লোকসমাজ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিল, যখন জনসমাজ দেখিল ভারতীয় সাধুগণ

যাহা করেন তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের দুঃসাধ্য, তখ নই তাহারা আপনাপনি সেই আচার্য্যকুলকে ভক্তি করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ তাদৃশ মহত্ত্ব-প্রধান লোক ভক্তিভাজন সন্দেহ নাই। এমন কি ইঁহা-দিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করাই পাপ। কেননা যাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মভাববর্দ্ধনের জন্য, আমাদিগের পাপ প্রবৃত্তি কমাইবার জন্য, আমাদিগের ঈশ্বরে ভক্তি পবিত্রতা বর্দ্ধনের জন্য প্রাণ দিয়া যত্ন করিয়াছেন, আমাদিগকে পাপী, অত্যাচারী, কদর্য্যচর্য্য, ভ্রান্তিলিপ্ত দেখিয়া যাঁহারা দয়াতে গলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের উপকারের জন্য যাঁহারা নিজের শারীরিক মানসিক কোন সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আমাদিগের জন্য যাঁহারা সমস্ত পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত কঠিন নিয়মে কালযাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি ভক্তি না করিয়া থাকা যায়? কখনই নহে। এই সময়ে মনুষ্যগণের হৃদয় নিহিত ভক্তি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া আপন সীমা অতিক্রম করে। যখন মানবহৃদয়ের বৃত্তিবিশেষ কোন দিকে বেগে ধাবিত হয়, জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে তাহা নিয়মিত করিয়া থাকেন। জ্ঞান মনুষ্যের পাপরূপ দুঃখ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার উড়ুপ। এই জ্ঞানোড়ুপ যাঁহারা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় পাপসমুদ্রে ডুবিয়া মরেন। এই জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সঙ্গে উভয়ের

সামঞ্জস্য আছে। মনুষ্য যখন জ্ঞান হারাইয়া কেবল অন্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে ভক্তিস্রোতের প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পৌত্তলিক হইয়া দাঁড়ায়। আবার ভক্তির মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শরণাপন্ন হইলেও সে শুষ্ক ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া নাস্তিকতা অথবা একাত্মবাদের শরণাপন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ পিতা, মাতা, আচার্য্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোক-দিগকে ভক্তি বিশ্বাস করা, স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রীতি বাৎসল্য করা, দাস দাসী ও দীন দরিদ্র প্রভৃতিকে দয়া করা, স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে পাপ হয়। কিন্তু এ সকল কার্য্যেরও সীমা আছে। সেই সীমার মধ্যে থাকিতে পারিলে আর পাপের ভয় নাই, লঙ্ঘিত হইলেই পাপ। মনুষ্যহৃদয়নিহিত জ্ঞান এই সীমার নিয়ামক। প্রবল ভক্তিস্রোতের মুখে নিপতিত হইয়া জ্ঞানের উপদেশ অবজ্ঞাত হইলে নিশ্চয়ই বিনাশ। এই জন্য দেখা যায় মনুষ্য এক সময়ে যাহা বিশুদ্ধ উপকারের প্রত্যাশায় করে, আপন সীমাতে না থাকিতে পারিয়া তাহা হইতেই আবার অত্যন্ত অপকৃত হয়। ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দীন দরিদ্রের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য দয়ার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যেমন পাপ জন্মে, ধর্ম্মের বিরোধে স্ত্রী পুত্রগণের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য প্রীতি স্নেহ অধিক হইলে যেমন পাপ হইয়া থাকে, বিবেকের আদেশ অবহেলা করিয়া পিতা মাতার প্রতি

নিতান্ত কর্ত্তব্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে যেমন পাপ হয়, উপদেষ্টাকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঠিক সেইরূপ। যাঁহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা তাঁহাকে না দিলে যেমন বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতে হয়, এক জনের প্রাপ্যাংশ অপরকে দিলেও ন্যায় বিচারে সেইরূপ বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে ও গুরুর প্রাপ্য গুরুকে দিতে হইবে, একের প্রাপ্য অপরকে দিতে পারা যায় না, দিলেই বিশ্বাসঘাতক বা চোর বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

মনে কর স্ত্রী ও কন্যা উভয়কেই প্রীতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীর প্রীতির অংশ কন্যাকে এবং কন্যার প্রীতির অংশ স্ত্রীকে দিবে বলিয়া কি কল্পনাও করিতে পার? যদি না পার, তবে ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা ভক্তি বা স্তুতি বন্দনাদি কদাচ গুরুকে দিতে পার না। এইরূপে জানা যাইতেছে যে, এক জনের প্রাপ্য অপরকে দিবার অধিকার বস্তুতঃ কাহারও নাই। অধিকার না থাকিলেও জ্ঞানশূন্য ভক্তি হইতে যে এক প্রকার মোহ জন্মে সেই মোহ আমাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলাইয়া দেয়, এবং আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। সেই মত্ততায় পড়িয়াই আমরা একের প্রাপ্য অন্যকে দিতে ভয় করি না। এই কারণে ভারতে "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং" পঠিত হইয়াছে। এই কারণেই শঙ্করাচার্য্য

" শঙ্করঃ সাক্ষাৎ " বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই কারণেই চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই কারণেই দাশরথি, ভার্গব, বাসুদেব প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। এই কারণেই ভারতে "গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।" পঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই শিষ্যগণ ঈশ্বরের প্রাপ্য যথাসর্ব্বস্ব গুরুর চরণে দিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। আবার এই অনুচিত অধিকার হস্তগত করিয়াই ভারতীয় আচার্য্যবংশ অধঃপাতে গিয়াছেন। ইহাঁরা যখন দেখিলেন শিষ্যগণের অন্ধ হইবার আর বাঁকি নাই, যখন দেখিলেন শিষ্যগণ অটল বিশ্বাস সহকারে সমস্ত ঐশী মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতেছে, এবং যাহা কখন কল্পনা করেন নাই তাহা নির্ব্বিঘ্নে পাইতেছেন, তখন তাঁহারা আনন্দে আপনাদিগের ভাবি পতন ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং ইহাঁদিগের স্বার্থ সাধনের উৎকৃষ্ট সুযোগ হইল। এই সুযোগে তাঁহারা পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রের স্থান বিশেষের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই তন্ত্র নামক অভিনব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সেই পরিবর্ত্তিত আদর্শ স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগের মনোরথ সিদ্ধির উপায় প্রস্তুত করিলেন। আমরা একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর বংশীয় উপদেষ্টৃত্ব কেমন ধূর্ত্ততাপূর্ণ।

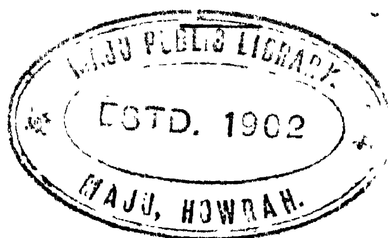
শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" ইহার অর্থ কি? ভগবান বলিয়াছেন, আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে, মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না, এবং অসূয়াও করিবে না। কেন না গুরু সর্ব্বদেবময়। ইহার প্রকৃত ভাব কি? সরল ভাবে ইহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়? গুরু যে সকল কার্য্য করেন ও যে সকল বাক্য বলেন তাহা তাঁহার নিজের নহে, তাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। তিনি ঈশ্বর হইতে যাহা প্রাপ্ত হন তাহা অবিকৃত রাখিয়া জগতে প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই, স্বার্থ নাই। সুতরাং গুরুর কার্য্য, গুরুর বাক্য সকলই ঈশ্বরের, সকলই দিব্য ভাবে পূর্ণ। অতএব ইহা বলা যায় যে, গুরু যদিও মানুষ তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা কর্ত্তব্য নহে; তাঁহার গুণে দোষ দৃষ্টি কর্ত্তব্য নহে। কেননা গুরুর কথা ও কার্য্য সকলই ঈশ্বরের, সর্ব্বপ্রকারে তাহা দিব্য ভাবের আধার। কিন্তু অধস্তন আচার্য্যবংশীয়গণ এই সুযোগে তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিলেন, গুরু আর ঈশ্বর এক, পূজা ও ভক্তি যাহা কিছু সকলই গুরুকে কর। গুরু গৃহে উপস্থিত থাকিতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া পূজা করা অপরাধ, অতএব তাহা কর্ত্তব্য নহে। পূজা ভক্তি সকলই গুরুচরণে অর্পণ কর। গুরু সন্তুষ্ট থাকিলেই

হইল। দেবতার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির দিকে শিষ্যের না তাকাইলেও ক্ষতি নাই, গুরুর সন্তুষ্টি নিতান্তই চাই, উহা না হইলেই চলিবে না। এই সকল ঘৃণ্য মত বহুলপরিমাণে প্রচারিত হইলে আচার্য্যগণের উত্তর বংশীয়েরা অলস, বিলাসপ্রিয়, শ্রমবিমুখ, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর হইতে লাগিল। এই জন্য ক্রমে তাহারা অর্থলোভী, ঈশ্বরদ্রোহী, ভদ্রতাবর্জ্জিত হইয়া উঠিল। এখন দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক মনে করেন না। যাঁহারা কিছু শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। ছল বল ও কৌশলক্রমে অতি সুবিধায় অর্থ পাইবেন এই জন্য তাঁহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা। শাস্ত্র মতে এ সকল গুরু একান্ত পরিত্যাজ্য*। এমন কি, এক বার মন্ত্র গৃহীত হইয়া থাকিলেও উপযুক্ত লক্ষণ সম্পন্ন গুরু প্রাপ্ত হইলেই ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে।† ঈদৃশ লোক গুরু হইলে কেবল অনিষ্ট হয়, সুতরাং আজীবন যদি বিনা গুরুতে কাটাইতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি অভদ্রতার অভিনেতাকে গুরু বা আচার্য্য বলিয়া স্বীকার কর্ত্তব্য নহে।

* পরিচর্য্যাযশোবিত্তলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরু র্নহি।

† তদেতৎ পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ, "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন সস্যাদি" ত্যাদি। ভক্তিসন্দর্ভে।

যিনি উদার, যিনি তপস্যানিরত, যিনি সত্য পরায়ণ ও দয়াশীল, যিনি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের প্রভুত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়, যিনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে গুপ্ত রাখিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, যিনি লোকের পাপ দর্শন করিয়া কৃপাপরবশ* হইয়া প্রাণ দিয়া তাহার পাপ দূর করিতে যত্ন করেন, তিনিই ভক্তিভাজন আচার্য্য, তিনিই উপদেষ্টা। তাঁহাকে সেই পরিমাণে ভক্তি কর, তাঁহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধা কর, যে পরিমাণে তিনি তোমার ঈশ্বর দর্শনের সহায়। যিনি ঈশ্বরলাভের পথের বিঘ্নপ্রদর্শন দূরে থাকুক প্রত্যুত আপনিই বিঘ্নস্বরূপ হইয়া মধ্যস্থলে উদিত হন, তিনি চোর মনুষ্যবিহীন পশু।



---

* কৃপালুশ্চ সুসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।